সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.net

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৪৫-৪৬

৩১ আগস্ট ২০২৬, সোমবার

মালাগার মাসজিদ, স্পেন

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

.٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ

বার্ষিক : ৭০০ টাকা

ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আন্তর্জাতিক

মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-

Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
শعار النضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার
৪৫-৪৬ সংখ্যা
৩১ আগস্ট-২০২৬ ঈসায়ী
১৬ ভাদ্র-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৭ রবীউল আওয়াল-১৪৪৮ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী
প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

মণির খনি: তাওহীদের অপরিহার্যতা ০২
সম্পাদকীয়: যে আয়না মুখ নয়, চরিত্র দেখায় ০৩
দারসুল কুরআন: সূরাতুল্ আস্‌র: পূর্ণাঙ্গ জীবনের ঐশী নকশা
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
দারসুল হাদীস: বিজাতীয় অনুকরণের পরিণতি
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
প্রবন্ধ– নৌকা ও নৌযাত্রা: কুরআন-হাদীসের আলোকে একটি পর্যালোচনা
ড. এস. এম আব্দুর রউফ- ১০
কুরআনের আলোকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন
মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন- ১৩
জান্নাত: পরিচয়, উদ্দেশ্য ও প্রতিশ্রুতি
মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা- ১৬
শিক্ষা ও সভ্যতা– ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২০
ক্বাসাসুল কুরআন: মাছের পেটে ইউনুস (আলায়হিস সালাম)
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৩
সমাজ চিন্তা: জিহাদী চেতনা বনাম জঙ্গি তৎপরতা
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ২৫
পরিবেশ-প্রকৃতি: জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সংঘটিত সংকট ও অদৃশ্য পরিণতি
নিকোলাস বিশ্বাস- ২৯
কবিতা: সংগ্রামী মুসলিম ৩১
জমঈয়ত সংবাদ ৩২
শুব্বান সংবাদ ৩৪
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৫
প্রচ্ছদ পরিচিতি: মালাগার মসজিদে আন্দালুসের জীবন্ত স্মৃতি
আবু ফাইয়ায- ৪৮

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.net,
www.jamiyat.org.bd, Page:ⓕshaptahikArafat,ⓕgroups/weeklyarafat

منجم جواهر / মণির খনি– তাওহীদের অপরিহার্যতা

অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা করো তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট জীবনোপকরণ কামনা করো এবং তাঁরই 'ইবাদত করো ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" *(সূরা আল-'আনকাবূত: ১৭)*

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে–

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কারো কাছে জীবিকা অনুসন্ধান করা এবং ভালো বা মন্দ যাই হোকনা কেন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কাউকে আহ্বান করা শির্‌ক। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

"তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।" *(সূরা আশ্-শু'আরা-: ২১৪)*

যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন রাসূলে কারীম (ﷺ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন,
ওগো কুরাইশ সম্প্রদায়! কিংবা এরূপ কোনো কথা– তোমরা নিজেদের প্রাণ কিনে নাও অর্থাৎ- মহান আল্লাহর 'আযাব হতে নিজেদের রক্ষা করো। কারণ আমি তোমাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকট কোনো কিছু করার অধিকার রাখি না। হে 'আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র 'আব্বাস! আমি মহান আল্লাহর নিকট আপনার জন্য কিছুই করতে সক্ষম নই। হে রাসূল (ﷺ)-এর ফুফু সাফিয়্যাহ্! আপনার ব্যাপারে মহান আল্লাহর দরবারে কোনো কিছুই করার কোনো অধিকার আমি রাখি না। আর হে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর তনয়া ফাতিমাহ্! আমার সম্পদ হতে যা ইচ্ছে তুমি চেয়ে নিতে পারো, কিন্তু আমি মহান আল্লাহর হুজুরে তোমার জন্য কোনো কিছুই করার কোনো অধিকার রাখি না। *(সহীহুল বুখারী)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

- বিদ'আত হতে শির্‌ক ও কুফ্‌রের উদ্ভব ঘটে। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

প্রথম যে স্তর দ্বারা নবী ও রাসূলদের দ্বীনে পরিবর্তন সূচিত হয় তা হচ্ছে শির্‌ক।

- শরিয়াতের সীমালংঘন করা শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*
- প্রকৃত ইল্‌ম ভুলে যাওয়াতেই শির্‌কের সূচনা হয়। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*
- নবী, রাসূল ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করা শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*
- উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাবাশ মুশরিকদের দ্বারা তৈরিকৃত একটি উপাসনাগৃহ এবং তাতে অবস্থিত মূর্তিসমূহের কথা উল্লেখ করলেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, তাদের মধ্যে কোনো ভালো লোক বা সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করতঃ এবং ঐ মসজিদের ভিতর ঐ সৎ লোকদের মূর্তি স্থাপন করত। সৃষ্টি জগতে ঐ সব লোক মহান আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট! কারণ তারা দু'টি ফিৎনার সমাবেশ ঘটিয়েছে। একটি কবর পূজার ফিৎনা আর একটি মূর্তি পূজার ফিৎনা। *(সহীহুল বুখারী)*
- সাধু-সজ্জনদের কবরগুলোকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করলেই এতে গাইরুল্লাহর 'ইবাদত হয়। *(কিতাবুত্ তাওহীদ)*

সাপ্তাহিক আরাফাত/عرفات أسبوعية
৬৭ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ॥ ৩১ আগস্ট-২০২৬ ঈ.

افتتاحية / সম্পাদকীয়

যে আয়না মুখ নয়, চরিত্র দেখায়

মানুষ আয়নায় নিজের মুখ দেখে; কিন্তু নিজের চরিত্র দেখবে কোন আয়নায়? আয়নার সামনে দাঁড়ালে মুখের সূক্ষ্ম দাগও আমাদের চোখে পড়ে, অথচ আচরণের বড়ো ত্রুটিগুলো অনেক সময় আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। তাই নিজের ভুল, অহংকার, অসংযম কিংবা তাচ্ছিল্য দেখতে শুধু আয়না নয়; প্রয়োজন এমন একজন মানুষের, যিনি ইসলাহ্ তথা সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাদের চরিত্রের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো তুলে ধরবেন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। মতের ভিন্নতা থাকবে, বিতর্ক হবে, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির আদান-প্রদান হবে– এটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু মতের অমিল যখন ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়, যুক্তির জায়গা যখন দখল করে নেয় বিদ্রূপ ও কটূক্তি, তখন শুধু আলোচনার পরিবেশই নষ্ট হয় না; ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যক্তির চরিত্র, ক্ষয়ে যায় সামাজিক রুচি, সংযম ও পারস্পরিক আস্থার ভিত।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ প্রবণতা এখন বিশেষভাবে দৃশ্যমান। বিশেষত ধর্মীয় বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে অনেক সময় যুক্তিনির্ভর আলোচনা দ্রুত ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকে গড়ায়। ভিন্নমত পোষণকারীকে হেয় করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা কিংবা অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করাকে যেন মতপ্রকাশের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ মনে করা হয়। আরো দুঃখজনক হলো, এমন ব্যক্তিদের মধ্যেও এ ধরনের অসংযত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, যারা দ্বীনের কথা বলেন! দাঈ' ইলাল্লাহ।

এখানেই আমাদের একটু থামা দরকার!

সঠিক কথা বলাই যথেষ্ট নয়; সঠিক কথাটি কীভাবে বলা হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। ভুলকে ভুল বলতে হবে। কথার অসংগতি ব্যাখ্যা করতে হবে। মনে রাখা উচিত যে, বক্তব্যকে খণ্ডন করা আর ব্যক্তিকে অপমান করা এক বিষয় নয়।

আমাদের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যে মতপার্থক্য নতুন কিছু নয়। পূর্ববর্তী আলেম ও মনীষীরা একে অন্যের মতের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন, তীব্র বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কেও অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের শক্তি ছিল ইল্ম, দলিল, যুক্তি ও আদব। ব্যক্তিগত অপমান তাঁদের জ্ঞানের বিকল্প হয়ে ওঠেনি।

আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই ভারসাম্যটির! কারণ অন্যের ভুল দেখা সহজ; নিজের ভুল দেখা কঠিন। আমরা অন্যের কথায় অহংকার শনাক্ত করি, কিন্তু নিজের ভাষায় অহংকার কখন প্রবেশ করেছে, তা অনেক সময় বুঝতে পারি না। অন্যের তাচ্ছিল্যে আহত হই, অথচ নিজের আচরণে একই তাচ্ছিল্য আছে কি না, তা ভেবে দেখি না। তাই জীবনে এমন একজন মানুষের প্রয়োজন, যিনি অকপটে আমাদের সামনে আমাদের ত্রুটিগুলো তুলে ধরবেন- দোষারোপের জন্য নয়, সংশোধনের জন্য; হেয় করার জন্য নয়, ইসলাহ'র উদ্দেশ্যে। যিনি বলবেন, "আপনার বক্তব্য ঠিক, কিন্তু ভাষার প্রয়োগ ঠিক হয়নি।" অথবা বলবেন, "যে ভুলটি আপনি অন্যের মধ্যে দেখছেন, একই ভুল আপনার আচরণেও ঢুকে পড়েছে।"

এই কথাগুলো শুনতে ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু সব ভালো লাগা সবসময় কল্যাণকর নয়। বাস্তবতা হলো, যে কথাটি আমাদের সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে ফেলে, অনেক সময় সেই কথাটিই আমাদের আত্মসংশোধনের পথে নিয়ে যায় এবং একসময় চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে।

আমাদের বুঝতে হবে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও চাটুকারের পার্থক্য ঠিক এখানেই। চাটুকার আমাদের খুশি রাখতে চায়; হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের সংশোধন করে। চাটুকার ভুল দেখেও নীরব থাকে, সীমা অতিক্রম করলেও আপত্তি করে না; বরং কখনো কখনো সেই ভুলকেই প্রশংসার আবরণে আরো শক্তিশালী করে তোলে। আর সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রয়োজনে অস্বস্তিকর সত্যও বলেন, কারণ তাঁর লক্ষ্য সন্তুষ্ট করা নয়; বরং তিনি আমাদের কল্যাণ চান। তবে আমাদের সমাজে সমালোচনা গ্রহণের সংস্কৃতি দুর্বল। কেউ প্রশংসা করলে তাকে আপন মনে হয়, আর কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে তাকে বিরোধী মনে হয়।

আমাদের মনে রাখা দরকার, আমার জ্ঞান আমার যোগ্যতার পরিচয় হতে পারে; কিন্তু আমার আচরণ আমার চরিত্রের পরিচয়। ইল্ম যদি মানুষকে বিনয়ী না করে, জ্ঞান যদি ভাষাকে সংযত না করে, তবে জ্ঞান ও চরিত্রের মধ্যে একটি ফাঁক তৈরি হয়।

বিশেষত যারা দ্বীনের কথা বলেন, তাঁদের দায়িত্ব আরো বেশি। কারণ তাঁদের ভাষা ও আচরণকে মানুষ অনেক সময় নিছক ব্যক্তিগত আচরণ হিসেবে দেখে না; এর সঙ্গে দ্বীনের সৌন্দর্য ও আদবেরও একটি সম্পর্ক খুঁজে নেয়। তাই প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে এক মুহূর্ত ভাবা প্রয়োজন। সামান্য আত্মজিজ্ঞাসাই অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে।

দাওয়াহ কিংবা মতবিনিময়ের উদ্দেশ্য কাউকে পরাজিত করা নয়; সত্যকে স্পষ্ট করা। তাই আমাদের ভাষায় দৃঢ়তা থাকবে, রূঢ়তা নয়; থাকবে স্পষ্টতা, অশালীনতা নয়; প্রতিবাদ থাকবে, বিদ্বেষ নয়। দলিল হবে আমাদের শক্তি, যুক্তি হবে আমাদের হাতিয়ার, আর আদব হবে আমাদের পরিচয়।

সুতরাং নিজেকে সত্যিকার অর্থে সফল-স্বার্থক ও আদর্শিক মানুষ দেখতে চাইলে, শুধু আয়নার সামনে দাঁড়ালেই হবে না; এমন একজন সত্যিকার মানুষের সামনেও দাঁড়াতে হবে, যিনি আমাদের মুখের নয়, চরিত্রের প্রতিবিম্ব দেখাতে পারেন।

درس القرآن / দারসুল কুরআন:

সূরাতুল্ আস্‌র: পূর্ণাঙ্গ জীবনের ঐশী নকশা

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

﴿وَالۡعَصۡرِ ○ إِنَّ الۡإِنۡسَانَ لَفِيۡ خُسۡرٍ ○ إِلَّا الَّذِيۡنَ آمَنُوۡا وَعَمِلُوۡا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

"সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"[১]

ভূমিকা

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী? অর্থ-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি, জমিজমা –এসবের কোনোটিই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ নয়। মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো সময় ও জীবন। কারণ অর্থ হারিয়ে গেলে তা আবার উপার্জন করা যায়, হারানো সম্পদ পুনরায় অর্জন করা যায়; কিন্তু জীবনের যে সময় একবার চলে যায়, তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। অথচ এই সময় নিয়েই মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে।

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-'আসরের শুরুতে সময়ের শপথ করেছেন। মাত্র তিন আয়াতের এই ছোট্ট সূরাটিতে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতার একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন– মানুষ মূলত ক্ষতির মধ্যেই রয়েছে। তবে চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ক্ষতি থেকে মুক্ত হতে পারবে। সেগুলো হলো– **১.** ঈমান, **২.** সৎকর্ম, **৩.** সত্যের উপদেশ, **৪.** ধৈর্যের উপদেশ।

সূরা আল-আসর-এর পরিচয়

সূরা আল-আসর পবিত্র কুরআনের **১০৩**তম সূরা। এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাত্র তিনিট আয়াতের একটি সূরা। অথচ মানব জাতির সফলতা ও মুক্তির পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা এতে রয়েছে।

সূরা আল-আসর-এর গুরুত্ব

বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যদি তার সৃষ্টির হিদায়াতের জন্য এই একটি মাত্র সূরা অবতীর্ণ করতেন, তবে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।" আব্দুল্লাহ ইবনু হিসান আবূ মদীনাহ বলেন,

'রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন দু'ব্যক্তি ছিলেন, যারা পরস্পর মিলিত হলে একজন অন্যজনকে সূরা আল-আস্‌র পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না।'[২]

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

﴿وَالۡعَصۡرِ﴾ "সময়ের শপথ!" এখানে ''আস্‌র' দ্বারা সময় বা যুগকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর শপথ করলে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা সময় পাই। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত –সবার জন্য দিনের সময় সমান। কিন্তু পার্থক্য হলো– কেউ এই সময়কে কাজে লাগিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, আর কেউ সময় নষ্ট করে নিজের আখিরাতের ক্ষতি করে।

সময় আসলে আমাদের জীবন থেকেই কেটে যাচ্ছে। আজকের একটি দিন চলে যাওয়া মানে আমাদের জীবনের একটি দিন কমে যাওয়া। গতকাল আর কখনো ফিরে আসবে না এবং আগামীকাল আমাদের জন্য নিশ্চিত নয়। তাই মু'মিনের উচিত প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করে কাজে লাগানো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ الۡإِنۡسَانَ لَفِيۡ خُسۡرٍ﴾

** এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

[১] সূরা আল-'আস্‌র: ১-৩।

[২] মুজামুল আওসাত- তাবরানী, ৫১২০; মুজামুল কাবীর- ২০/৭০; শু'আবুল ঈমান- বাইহাক্বী, ৯০৫৭।

"নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।"
এখানে 'খুসর' অর্থ ক্ষতি, লোকসান বা ধ্বংস।

মানুষ কেন ক্ষতিগ্রস্ত?

ব্যবসায়ী যদি তার মূলধন হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু মানুষের প্রকৃত মূলধন হলো তার জীবন ও সময়। প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনও শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তাই যে ব্যক্তি জীবনের সময়টাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় না করে গাফেল অবস্থায় কাটিয়ে দেয়, প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সবচেয়ে বড় সম্পদ নষ্ট করছে। প্রখ্যাত মুফাস্সীর ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে কাবীর-এ উল্লেখ করেন,

'সূরা আল-আসর-এর ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (মানুষ চরম ক্ষতির মধ্যে রয়েছে) এ আয়াতের গভীর অর্থ প্রথমে আমি অনুধাবন করতে পারছিলাম না। পরবর্তীতে একটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার হয়। ঘটনাটি হলো– প্রচণ্ড গরমে বাজারের এক বরফ বিক্রেতা চিৎকার করে বলছিল, 'ওহে লোকসকল! দয়া করে এমন এক ব্যক্তির ওপর রহম করো, যার পুঁজি বা মূলধন প্রতি মুহূর্তে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে'; তার হাঁকডাক শুনে ইমাম রাজি উপলব্ধি করলেন, মানুষের জীবনটাও ঠিক ওই বরফের মতোই প্রতি মূহূর্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ক্ষতি থেকে মুক্তির চারটি শর্ত: আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে মানুষের এই ক্ষতি থেকে মুক্তির চারটি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

১. ঈমান: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

"তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে।"

সফলতার প্রথম শর্ত হলো– বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমান আনতে হয় ছয়টি বিষয়ের প্রতি। যথা- মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান –এসব ঈমানের মৌলিক বিষয়।

শুধু মুখে ঈমানের দাবি করলেই হবে না; ঈমান মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে হবে।

ঈমান মূলত একজন মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনযাত্রাকে এমনভাবে বদলে দেয়, যা তার জীবনের প্রতি মূহূর্তের অপচয় রোধ করে সময়কে বাঁচিয়ে দেয়। একজন মু'মিন বিশ্বাস করে যে, তার জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব কিয়ামতের মাঠে মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কোনো বান্দা এক কদমও নড়তে পারবে না, যার অন্যতম হলো– সে জীবন ও যৌবনের সময়টা কোথায় এবং কীভাবে ব্যয় করেছে?'[৩]

২. সৎকর্ম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ "এবং সৎকর্ম করেছে।"

ঈমানের পরেই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে বুঝা যায়, ঈমানের দাবির সঙ্গে 'আমল জড়িত।

সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, যাকাত দেওয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, পিতা-মাতার সেবা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মানুষের উপকার করা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা –এ সবই সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

একজন মু'মিনের প্রতিটি দিন যেন কোনো না কোনো নেক 'আমল দিয়ে সমৃদ্ধ হয়। ফলে তার জীবনের মূল্যবান সময় কোনোভাবে নষ্ট হয় না।

৩. সত্যের উপদেশ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾

"এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে।"

নিজে ভালো থাকাই যথেষ্ট নয়। একজন মু'মিন অন্য মু'মিনেরও কল্যাণ কামনা করবে। তাই সে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের উৎসাহ দেবে এবং অন্যায় থেকে সতর্ক করবে।

তবে সত্যের দা'ওয়াত দিতে হবে হিকমত, সুন্দর ভাষা ও উত্তম পদ্ধতিতে। কাউকে অপমান করা বা অহংকারের সঙ্গে কথা বলা ইসলামে দা'ওয়াতের পদ্ধতি নয়।

দা'ওয়াত দিতে হবে বিনয়ের সাথে, কল্যাণের দিকে। মানুষ একা একা কখনো ভালো থাকতে পারে না। আপনি নিজে সময়ের মূল্য দিতে পারেন, কিন্তু আপনার চারপাশের বন্ধুরা যদি সময়ের অপচয়কারী হয়। তবে এক সময় আপনার সময়ও নষ্ট হবে, যখন

---

[৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১৬, সহীহ।*

আপনি অন্যকে সত্যের দা'ওয়াত দিবেন তখন সমাজে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে, যেখানে কারো সময় নষ্ট হবে না। সবাই সময়ের মূল্য দিবে।

৪. ধৈর্যের উপদেশ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"

সত্যের পথে চলতে গেলে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। 'ইবাদত করতে ধৈর্য প্রয়োজন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে ধৈর্য প্রয়োজন এবং বিপদ-মুসিবতে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতেও ধৈর্য প্রয়োজন।

তাই মু'মিন নিজে ধৈর্য ধারণ করবে এবং অন্যকেও ধৈর্যের উপদেশ দেবে। এতে করে বিপদের সময়টাও ধৈর্যের মাধ্যমে সুন্দরভাবে কেটে যাবে।

সময় নষ্টের ভয়াবহতা: আজকের পৃথিবীতে সময় নষ্ট করার অন্যতম বড় মাধ্যম হলো অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনর্থক কথাবার্তা, বিনোদন ও গীবত-পরনিন্দায় সময় চলে যায়। অথচ মানুষ জানে না –তার জীবনের কতটুকু সময় ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

"দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত–সুস্থতা ও অবসর।"[৪]

সুস্থতা ও অবসর– দু'টিই মহান আল্লাহর বড় নিয়ামত। কিন্তু মানুষ সাধারণত এগুলোর মূল্য তখনই বুঝতে পারে, যখন এগুলো তার হাতছাড়া হয়ে যায়।

একজন মু'মিন কীভাবে সময়কে কাজে লাগাবে?

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে সময়ের কেন্দ্র বানাতে হবে: সালাত মু'মিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'আমলগুলোর একটি। সালাতের সময় ঠিক রাখলে জীবনের সময় ব্যবস্থাপনাও অনেকটা সুশৃঙ্খল হয়।

২. প্রতিদিন কুরআনের জন্য সময় রাখতে হবে: অল্প হলেও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ বুঝা ও সে অনুযায়ী 'আমল করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. প্রতিদিনের 'আমলের হিসাব করতে হবে: দিন শেষে নিজেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে– আজ আমি কী শিখলাম? কী নেক 'আমল করলাম? কোন গুনাহ থেকে বাঁচলাম? কার উপকার করলাম? আমার কত সময় অনর্থক চলে গেল?

৪. অনর্থক কাজ পরিত্যাগ করতে হবে: মু'মিনের একটি বড় গুণ হলো– সে অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾

"এবং যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকে।"[৫]

৫. মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে হবে: মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে মানুষ সময়ের মূল্য বুঝতে পারে। কারণ মৃত্যুর পর সময় থাকবে কিন্তু 'আমলের সুযোগ থাকবে না।

উপসংহার

সূরা আল-'আস্‌র আমাদের সামনে মানুষের জীবনের সফলতার সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশ তুলে ধরেছে। আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করে জানিয়ে দিয়েছেন –মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। সেই ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে শুধু দীর্ঘ জীবন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সঠিক ঈমান, সৎ 'আমল, সত্যের দা'ওয়াত এবং ধৈর্য।

আমাদের বয়স যত বাড়ছে, আমাদের জীবন তত কমছে। তাই প্রশ্ন হলো– আমরা কত বছর বেঁচেছি তা নয়; বরং যে সময় পেয়েছি, তা দিয়ে মহান আল্লাহর জন্য কী করেছি?

আজকের দিনটি আর ফিরে আসবে না। এই মুহূর্তটিও আর ফিরে আসবে না। অতএব, আসুন! আমরা অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যবান করে তুলি এবং এমনভাবে সময় ব্যয় করি, যাতে মৃত্যুর সময় আফসোস করতে না হয়।

হে আল্লাহ! আমাদের সময়ের মূল্য বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের ঈমানকে মজবুত করুন, সৎ 'আমল করার তাওফীক্ব দিন, সত্যের পথে অটল রাখুন এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের জীবন ও সময়কে আপনার সন্তুষ্টির কাজে কবুল করুন –আমীন।

---

[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১২।*

[৫] *সূরা আল-মু'মিনূন: ৩।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস:

বিজাতীয় অনুকরণের পরিণতি

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

সরল বাংলা অনুবাদ

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সেই ব্যক্তি সেই জাতির দলভুক্ত।[৬]

হাদীসের ব্যাখ্যা

কাফিরদের অনুকরণ, অনুসরণ ও তাদের সামঞ্জস্য বিধান করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে মারাত্মক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়, যা ইসলাম সীমাহীন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে। আর নবী (ﷺ), যিনি তার আমানত যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন, তিনি উম্মতকে বহু হাদীসে এবং বিভিন্ন সময় ও সুযোগে কাফিরদের অনুকরণ করার ব্যাপারে কখনও সার্বিকভাবে আবার কখনও কখনও সবিস্তারে সতর্ক করে দিয়েছেন। অথচ এ উম্মতের মধ্য থেকে কতিপয় দল ও গোষ্ঠী এ অনুসরণ-অনুকরণ করার কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে, যদিও তাদের তাতে জড়িত হওয়ার পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। আবার সময়ে সময়ে এ কাজের ভয়াবহতাও ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের, তবে সম্ভবত আমার পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলা হবে না যদি এটা বলি যে, এ যুগের মুসলিমগণ যে হারে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করছে, তা অতীতের যে কোনো সময়ে (উম্মত কর্তৃক কাফিরদের) অনুসরণ-অনুকরণ করার চেয়ে অত্যধিক ভয়ঙ্কর পর্যায়ের।

হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে। এর অর্থে আল মানাভী ও আলকামী বলেন: যে প্রকাশ্যে তাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করলো, পোশাক-পরিচ্ছদে তাদের জীবনাচার ও সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনে তাদের কিছু কাজকর্ম গ্রহণ করলো। মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন: এর অর্থ হলো– যে তার নিজের পোশাক বা অন্য কিছুতে কাফির, ফাসিক, পাপিষ্ঠ, সূফী ইত্যাদি জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে। মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, "সে তাদের অন্তর্ভুক্ত"-এ বাক্যাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাদৃশ্য অবলম্বনকারীরা গুনাহ ও কল্যাণে সাদৃশ্য অবলম্বনকৃতদের অংশীদার হবে। মোল্লা 'আলী ক্বারী বলেন: যে ব্যক্তি নেককার ব্যক্তিদের সাথে সাদৃশ্য রাখে তারা সম্মানিত হবে যেভাবে নেককাররা সম্মানিত হন। আর যারা ফাসিকদের সাথে সাদৃশ্য রাখে তারা সম্মানিত হবে না। তবে তাদের ওপর যদি সম্মানিতদের নিদর্শন পরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা সম্মানিত হবে কিন্তু বাস্তবে সে সম্মানের যোগ্য নয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আস্ সিরাত আল মুসতাকিম" গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-সহ অনেকেই এ হাদীস দ্বারা দলিল দেন যে, কাফির-মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।"[৭]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: 'কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণের বিষয়ে মূলনীতি কী?'

তিনি উত্তর দেন: 'কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণের বিষয়টি বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হতে পারে। কারণ সাদৃশ্য গ্রহণ শব্দটি ব্যাপক। এর অর্থ হলো– ব্যক্তি এমন কিছু করবে যা কাফিরদের জন্য বিশিষ্ট। যার ফলে কেউ তাকে দেখলে কাফিরদের দলভুক্ত মনে করবে। এটি হচ্ছে মূলনীতি। কিন্তু যদি কোনো জিনিস কাফির ও মুসলিম সবার মাঝে প্রচলিত থাকে তাহলে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়িয হবে; যদিও মূলত সেটি কাফিরদের থেকে গৃহীত হোক; যদি না সেটি সত্তাগতভাবে হারাম হয়। যেমন- রেশমের পোশাক পরা।[৮]

যারা অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তারা রাসূলের উম্মত হতে পারে না। 'আম্র বিন্ শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।*

[৬] *সুনানে আবূ দাউদ- ৪০৩৩; সহীহুল জামে'- ৬১৪৯।*

[৭] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৫১।*

[৮] *মাজমূ দুরূস ওয়া-ফাতাওয়াল হারাম আল-মাক্কী- ৩/৩৬৭।*

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ.

সে আমার উম্মত নয় যে অমুসলিমদের সাথে কোনোভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখলো। তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে কোনোভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখো না। কারণ, ইহুদিরা সালাম দেয় আঙ্গুলের ইশারায়। আর খ্রিষ্টানরা সালাম দেয় হাতের ইশারায়'।[৯] আপনি যতই অমুসলিমদের অনুকরণ করেন না কেন? তারা আপনাকে কখনই পছন্দ করবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡ﴾

"আর ইয়াহূদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।"[১০]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকেদের নীতি-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি দবের গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহূদী ও নাসারা? তিনি বললেন: আর কারা?[১১]

বিজাতির অনুকরণ করেও মুসলিম নিজের পরিবেশে বিদআত সৃষ্টি করে থাকে। অমুসলিমের কর্মকে পছন্দ করে তা নিজের করণীয় ধর্ম ভেবে বসে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, হুনাইনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাত্রা শুরু করলেন। তিনি মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গাছটিকে যাতু আনওয়াত' বলা হতো। তারা এর মধ্যে তাদের অস্ত্রসমূহ লটকিয়ে রাখত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। তাদের যাতু আনওয়াতের মতো আমাদের জন্য একটা যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর উম্মাতের কথার মতো হলো। তারা বলেছিল, কাফিরদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে তদ্রুপ আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীগণের নীতি অবলম্বন করবে।[১২]

অতএব উক্ত হাদীসে স্পষ্ট হয় যে, কাফিরদের অনুকরণই বানী ইসরা-ঈল এবং কিছু নও মুসলিম সাহাবীকে এমন নিকৃষ্ট আবেদনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর সে আবেদন ছিল এমন মা'বূদ গড়া বা নির্দিষ্ট করা যেমন কাফিরদের ছিল; যার নিকট তারা ধ্যানমগ্ন হত, বরকতের আশায় তার উপর অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার আরাধনা করত।

যেসব বিষয়ে কাফির ও অন্যান্যদের অনুসরণ-অনুকরণ করার ব্যাপারে সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে: তা চার প্রকার। যথা-

প্রথম প্রকার– 'আক্বীদার বিষয়সমূহ– আর এগুলো অনুকরণের বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে অনুসরণ-অনুকরণ করা কুফ্‌রী ও শির্‌ক। উদাহরণস্বরূপ, সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের পবিত্রতার গুণগান বর্ণনা করা। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার 'ইবাদত করা; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সৃষ্ট কাউকে মহান আল্লাহর কন্যা বা পুত্র বলে দাবি করা, যেমন খ্রিষ্টানগণ বলে– মাসীহ মহান আল্লাহর পুত্র এবং ইয়াহূদীগণ বলে– উযায়ের মহান আল্লাহর পুত্র। অনুরূপভাবে দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা। আর এর থেকে যেসব কুফ্‌রী ও শির্‌কী বিষয়সমূহ শাখা-প্রশাখা হিসেবে বের হয়ে আসবে, সেগুলো সবই 'আক্বীদাহ্‌গত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার– যা উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট: আর উৎসবসমূহের অধিকাংশ যদিও 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তা কখনও কখনও প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়ে থাকে। সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে শরী'আতের বহু ভাষ্যে বিশেষভাবে সেগুলোতে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করা থেকে জোরালোভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর তাই দেখা যায় যে, মুসলিমদেরকে বছরে দু'টি 'ঈদ উৎসব পালনের ওপর সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাকী যেসব উৎসব রয়েছে যেমন- জন্ম উৎসব, জাতীয় বিভিন্ন উৎসব কিংবা নিয়মিত

[৯] *জামে তিরমিযী- ২৬৯৫।*
[১০] *সূরা আল-বাকারাহ্‌: ১২০।*
[১১] *বুখারী- ৭৩২০; ফাতহুল বারী- ১৩/৩০০; মুসলিম- ২৬৬৯।*
[১২] *জামে তিরমিযী- ২১৮০।*

উৎসবসমূহ, যা বছরে একদিন পালিত হয় অথবা মাসে একদিন পালিত হয় অথবা পালাক্রমে একদিন পালিত হয় অথবা প্রতি সপ্তাহে একদিন পালিত হয়, যা জাতির লোকেরা নিয়ম করে পালন করে থাকে –এ সব উৎসবের সবই সুস্পষ্টভাবে হাদীসে আগত নিষিদ্ধ অনুসরণ-অনুকরণের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় প্রকার– 'ইবাদত: নবী (ﷺ) থেকে আগত শরী'আতে 'ইবাদতের ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণ করা থেকে নিষিদ্ধ করে বহু বক্তব্য বিস্তারিতভাবে এসেছে। তন্মধ্যে অনেক বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য এসেছে, যাতে আমাদেরকে কাফিরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে আদায় করা, সাহরী না খাওয়া, বিলম্বে ইফতার করা ইত্যাদি, যে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

চতুর্থ প্রকার– প্রথা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ: উদাহরণস্বরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ। এটাকে 'প্রকাশ্য আদর্শ বা সুস্পষ্ট রীতি-নীতি' বলা হয়ে থাকে। বস্তুত প্রকাশ্য আদর্শ বলতে বুঝায়, আকার-আকৃতি ও বেশভূষার আদর্শ যেমন পোষাক। অনুরূপভাবে চালচলন ও চারিত্রিক রীতি-নীতি। এসব ক্ষেত্রেও অনুকরণ-অনুসরণের নিষিদ্ধ করে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত উভয়ভাবেই সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। যেমন- দাড়ি মুণ্ডন করা থেকে নিষেধাজ্ঞা, স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা থেকে নিষেধাজ্ঞা, কাফিরদের ইউনিফর্ম জাতীয় পোষাক পরিধান করা থেকে নিষেধাজ্ঞা, নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা ও নারী-পুরুষে মেলামেশা করা থেকে এবং পুরুষগণ কর্তৃক নারীদের (বেশভূষার) অনুকরণ করা এবং নারীগণ কর্তৃক পরুষদের অনুকরণ করা, ইত্যাদি বিবিধ প্রথা থেকে নিষেধাজ্ঞা।

কাফির তথা বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রই মুসলিমগণ কর্তৃক কাফিরদের অনুসরণ-অনুকরণে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ। আর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, যেমন- তিনি বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে বাদ দিয়ে অন্যকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে কোনো কার্পণ্য করবে না। তারা তোমাদের ব্যাপারে তাই কামনা করে যা তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক। কোনো কোন সময় তাদের মুখ থেকেই এই বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে যায়। তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রেখেছে তা আরো জঘন্য।"[১৩] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

"কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফ্রী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের ওপর কোনো কল্যাণ নাযিল হোক।"[১৪]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ﴾

"হে মু'মিনগণ যারা অবিশ্বাস করেছে যদি তোমরা তাদের আজ্ঞাবহ হও তবে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদ ফিরিয়ে নেবে তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে।"[১৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ﴾

"তোমরা যদি কিতাবধারীদের কোনো দলের অনুসরণ করো তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেবে।"[১৬]

উপসংহার

ইসলামের অনুসারীদের জন্য শুধু 'ইবাদত-বন্দেগি নয়; বরং আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও জীবনধারার ক্ষেত্রেও নিজস্ব পরিচয় বজায় রাখা অপরিহার্য। অন্য জাতির অন্ধ অনুকরণ ইসলামে কঠোরভাবে নিরুৎসাহী করা হয়েছে, কারণ এতে মুসলিম সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মুসলিমরা নিজেদের আদর্শ ত্যাগ করে ক্রমশঃ অমুসলিমদের নীতি পদ্ধতি গ্রহণ করছে। অশ্লীলতা, নাচ, গান, বাদ্য, নারীদের অধিকারের নামে উলঙ্গপনা, থার্টি ফাস্ট নাইট, ভেলেনটাইন ডে, সেকুলারিজম, ভাস্কর্যের নাম দিয়ে মূর্তি পূজার বিস্তৃতি, এক মিনিট নীরবতা, পার্টি পলিটিক্স, নারী দেহ সম্বলিত বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আজ মুসলিমদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। মুসলিমদের প্রতিটি ঘরে আজ নগ্ন ছায়াছবি দেখা হচ্ছে। মুসলিমরা জুমার ফরয সালাত বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলা ও খেলা দেখাকে আবশ্যিক করে নিয়েছে। মুসলিমের প্রধান পরিচয় হচ্ছে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দান। কিন্তু আজ তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসকেই প্রকৃত জীবন মনে করছে। তারা আজ অমুসলিমদের অনুগত গোলামের মতো কাজ করছে। একজন মুসলমানের প্রকৃত কর্তব্য হলো– প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করা।

---

[১৩] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১১৮।*

[১৪] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১০৫।*

[১৫] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৪৯।*

[১৬] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১০০।*

مقالات/ প্রবন্ধ

নৌকা ও নৌযাত্রা: কুরআন-হাদীসের আলোকে একটি পর্যালোচনা

ড. এস. এম আব্দুর রউফ*

ভূমিকা: নৌকা ও জাহাজ মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবহনব্যবস্থার অন্যতম। নদী, সমুদ্র ও মহাসাগর অতিক্রম করে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবন-জীবিকার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। ইসলামের মৌলিক উৎস পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে নৌকা ও নৌযাত্রার বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। কোথাও নৌকাকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কোথাও নৌকাকে মানুষের সামাজিক দায়িত্বের একটি চমৎকার উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কোথাও সমুদ্রের পানি, নৌযানে ‘ইবাদত এবং সমুদ্রযাত্রার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

নৌকা প্রসঙ্গে ইসলামি শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– মানুষ যেন বাহন ও প্রযুক্তির প্রতি মুগ্ধ হয়ে স্রষ্টাকে ভুলে না যায়; বরং নৌযান দেখে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, তাঁর নিয়ামত এবং মানুষের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে।

১. নৌকা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন: আল্লাহ বলেন,

﴿وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾

“তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো– আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে বহন করেছি। আর তাদের জন্য অনুরূপ আরো অনেক বাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।”[১]

এ আয়াতে নৌযানকে আল্লাহর একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশাল পানি ও উত্তাল ঢেউয়ের ওপর একটি ভারী নৌযান কীভাবে চলাচল করে –এটি মানুষের জন্য গভীর চিন্তার বিষয়। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে নৌযান নির্মাণ করলেও পানির বৈশিষ্ট্য, বাতাস, নদী-সমুদ্র এবং মানুষের বুদ্ধিমত্তা –সবই আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব নৌকা মানুষের জন্য শুধু একটি বাহন নয়; এটি মহান আল্লাহর নিয়ামত ও কুদরতের একটি নিদর্শন।

২. নৌকা মানুষের জন্য মহান আল্লাহর নিয়ামত: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾

“আল্লাহই তোমাদের জন্য সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযান তাতে চলাচল করতে পারে।”[২]

অন্যত্র তিনি বলেন–

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾

“তিনি তোমাদের জন্য নৌযানকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তা তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে চলাচল করে।”[৩]

এই আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, নৌযান মানুষের জন্য মহান আল্লাহর একটি বিশেষ নিয়ামত। মানুষের উচিত এই নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করা এবং এর জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

৩. নৌকার মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্বের শিক্ষা: নৌকা সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলোর একটি হলো আবূ মূসা আল-আশআরি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا.

অর্থ: “আল্লাহর সীমারেখা রক্ষাকারী এবং তা লঙ্ঘনকারীর দৃষ্টান্ত এমন এক সম্প্রদায়ের মতো, যারা একটি নৌযানে আরোহণ করল। তাদের কেউ নৌকার ওপরের অংশে এবং কেউ নিচের অংশে স্থান পেল। নিচের লোকেরা যখন পানি সংগ্রহ করতে চাইত, তখন তাদের ওপরের লোকদের পাশ দিয়ে যেতে হতো। একপর্যায়ে তারা বলল, ‘আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিই এবং ওপরের লোকদের কষ্ট না দিই!’ এখন ওপরের লোকেরা যদি তাদেরকে তাদের এ কাজ করতে দেয়, তাহলে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তাদের হাত ধরে বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও রক্ষা পাবে এবং সবাই রক্ষা পাবে।”[৪]

*****সহকারী অধ্যাপক, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, পোস্ট: ধামরাই-১৩৫০, উপজেলা: ধামরাই, ঢাকা।

[১] *সূরা ইয়া-সীন: ৪১-৪২।*

[২] *সূরা আল-জা-সিয়াহ্: ১২।*

[৩] *সূরা ইব্‌রা-হীম: ৩২।*

[৪] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুশ্ শিরকাহ, হা. ২৪৯৩; সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ফাযায়েল, হা. ২৬৮৬।*

হাদীসের শিক্ষা: এই হাদীসে নৌকাকে একটি সমাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একটি নৌকায় যেমন একজন যাত্রীর ভুলের কারণে সবাই বিপদে পড়তে পারে, তেমনি একটি সমাজে একজনের অন্যায়ের ক্ষতি অনেক সময় পুরো সমাজের ওপর পড়তে পারে।

তাই সমাজে অন্যায়, অনাচার ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড দেখে নীরব থাকা উচিত নয়। সামর্থ্য ও শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে অন্যায় প্রতিরোধ করা সামাজিক দায়িত্ব।

৪. নৌযাত্রা ও সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ: সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হলো সমুদ্রের পানি সম্পর্কে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

অর্থ: “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রযাত্রা করি এবং অল্প পরিমাণ পানি সঙ্গে নিয়ে যাই। আমরা যদি সেই পানি দিয়ে ওযূ করি, তাহলে পান করার জন্য পানি কমে যাবে। তাহলে কি আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি?’ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘সমুদ্রের পানি পবিত্রকারী এবং তার মৃত প্রাণী হালাল’।”[১]

হাদীসের বিধান: এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়– **১.** সমুদ্রের পানি পবিত্র। **২.** সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করা বৈধ। **৩.** সমুদ্রের পানি দিয়ে গোসল করাও বৈধ। **৪.** সমুদ্রের মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ। এটি নৌযাত্রী ও সমুদ্রভ্রমণকারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শরয়ি নির্দেশনা।

৫. নৌযানে সালাত আদায়: ইসলামে সফর অবস্থায়ও সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। নৌকা বা জাহাজে অবস্থান করলেও সালাতের সময় হলে সালাত আদায় করতে হবে। সামর্থ্য থাকলে দাঁড়িয়ে, কিবলামুখী হয়ে এবং যথাযথ রুকূ‘-সিজদার মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে।

নৌযান চলমান থাকায় কিবলা পরিবর্তিত হলে সামর্থ্য অনুযায়ী কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। দাঁড়ানো সম্ভব না হলে সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করা হবে। এখানে ইসলামের একটি মৌলিক নীতি প্রযোজ্য–

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“তোমরা যতটুকু সক্ষম, ততটুকু মহান আল্লাহকে ভয় করো।”[২]

অতএব নৌযাত্রা সালাত পরিত্যাগের কারণ হতে পারে না।

৬. তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সমুদ্রযাত্রা: নৌযাত্রা সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসগুলোর একটি হলো তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র ঘটনা।

তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। প্রচণ্ড বাতাস ও ঢেউয়ের কারণে তাঁদের নৌযান দীর্ঘ সময় সমুদ্রে ভাসতে থাকে। অবশেষে তারা একটি দ্বীপে পৌঁছান। সেখানে তারা একটি অদ্ভুত প্রাণীর সাক্ষাৎ পান। পরে সেই প্রাণী তাদেরকে একজন ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়। যিনি নিজেকে দাজ্জাল হিসেবে পরিচয় দেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

এই ঘটনা তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেন।[৩] এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, সমুদ্রযাত্রা কখনো কখনো মানুষকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে পারে যা তার ধারণার বাইরে। তাই মু’মিনের উচিত সফরের সময় মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা।

৭. নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা ও মহাপ্লাবন: কুরআনে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকার ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾

“আর নৌযানটি তাদের নিয়ে পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে চলতে লাগল।”[৪]

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা ছিল ঈমানদারদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তির মাধ্যম। অন্যদিকে যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল তারা মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল। এখানে নৌকা একটি গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা বহন করে– মানুষের প্রকৃত নিরাপত্তা তার সম্পদ, শক্তি বা বাহনে নয়; বরং মহান আল্লাহর আনুগত্যে।

৮. বাহনে আরোহণের সময় মহান আল্লাহকে স্মরণ: নৌকা, জাহাজ কিংবা অন্য যেকোনো বাহনে আরোহণের

---

[১] *সুনান আবূ দাঊদ- কিতাবুত্ তাহারাহ, হা. ৮৩; সুনান আত-তিরমিযী- কিতাবুত্ তাহারাহ, হা. ৬৯; সুনান আন-নাসায়ী- হা. ৫৯, হাদীসটি সহীহ।*

[২] *সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬।*

[৩] *সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সা‘আহ, হা. ২৯৪২। এটি তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র দীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ হাদীস; সহীহ মুসলিমে বর্ণিত।*

[৪] *সূরা হূদ: ৪২।*

সময় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾

"যাতে তোমরা তার পিঠে স্থিরভাবে বসতে পারো, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা তাতে আরোহণ করো।"[1]

এরপর বলা হয়েছে–

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এটিকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন; অথচ আমরা নিজেরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না। আর অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব।"[2]

এই দু'আটি নৌকা বা যেকোনো বাহনে আরোহণের সময় পড়া সুন্নত।

৯. নৌযাত্রায় বিপদ ও মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা: সমুদ্র ও নদী শান্ত থাকলে নৌযাত্রা আনন্দদায়ক হয়; কিন্তু ঝড়, তুফান ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের সময় মানুষ তার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারে। কুরআন মানুষের এই দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছে–

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

"তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে।"[3]

মানুষ বিপদে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রকৃত অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। একজন মু'মিনের উচিত শুধু বিপদের সময় নয়, স্বাভাবিক অবস্থাতেও মহান আল্লাহকে স্মরণ করা।

১০. নৌকা ও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা: নৌকার হাদীসটি ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নৌকার নিচের অংশের যাত্রীরা যদি নিজেদের সুবিধার জন্য নৌকার তলায় ছিদ্র করে, তাহলে শুধু তাদের অংশই ডুববে না; পুরো নৌকাই ডুবে যাবে। একইভাবে–

✶ একজনের অন্যায়ের প্রভাব সমাজে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ✶ অন্যায়ের প্রতি নীরবতা কখনো কখনো অন্যায়কে শক্তিশালী করে। ✶ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে। ✶ সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায় প্রতিরোধ করা সামাজিক নিরাপত্তার অংশ। ✶ সমাজের কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই উপমা শুধু নৌকা সম্পর্কে একটি ঘটনা নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নীতিশিক্ষা।

১১. নৌযাত্রার ইসলামি আদব: কুরআন-হাদীসের আলোকে নৌযাত্রার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা উচিত–

প্রথমতঃ নৌযানে ওঠার সময় মহান আল্লাহর নাম ও বাহনে আরোহণের দু'আ পড়া।

দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহর নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা।

তৃতীয়তঃ নৌযানে সালাতের সময় হলে সালাত আদায় করা।

চতুর্থতঃ নিরাপত্তাবিধি মেনে চলা এবং নিজের জীবনকে অযথা ঝুঁকির মধ্যে না ফেলা।

পঞ্চমতঃ সহযাত্রীদের কষ্ট না দেওয়া।

ষষ্ঠতঃ নৌযানের কোনো অংশের ক্ষতি না করা এবং অন্যের জীবন বিপন্ন না করা।

সপ্তমতঃ বিপদের সময় মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করা।

উপসংহার: কুরআন ও হাদীসের আলোকে নৌকা ও নৌযাত্রা একটি বহুমাত্রিক বিষয়। নৌকা একদিকে মানুষের জন্য মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন, অন্যদিকে এটি মানুষের সামাজিক দায়িত্বের একটি অসাধারণ উপমা।

নৌকার হাদীস আমাদের শেখায়– একজনের অন্যায়কে অবহেলা করলে তার ক্ষতি শেষ পর্যন্ত সবাইকে বহন করতে হতে পারে। সমুদ্রের পানি সম্পর্কিত হাদীস আমাদের পবিত্রতা ও ওযূর গুরুত্বপূর্ণ বিধান শিক্ষা দেয়। তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ঘটনা সমুদ্রযাত্রার একটি বিস্ময়কর বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। আর নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা আমাদের শেখায় যে প্রকৃত মুক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত।

অতএব নৌযাত্রা একজন মু'মিনের জন্য শুধু ভ্রমণ বা বিনোদনের বিষয় নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর কুদরত চিন্তা করা, তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, 'ইবাদতের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের একটি সুযোগ।

---

[1] *সূরা আয্-যুখরুফ: ১৩।*
[2] *সূরা আয্-যুখরুফ: ১৩-১৪।*
[3] *সূরা আল-'আনকাবূত: ৬৫।*

কুরআনের আলোকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন

মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন★

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– "Example is better than precept." অর্থাৎ- উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত ভালো। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে সমস্ত কিছুর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। মানুষের সৃষ্টি থেকে শুরু করে তার স্বভাব-প্রকৃতি ও চূড়ান্ত পরিণতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কুরআনুল কারীমে আছে। এ পৃথিবীতে মানুষের সাথে মানুষ নানামুখী সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। যেকোনো সম্পর্কের পিছনে রয়েছে কোনো না কোনো স্বার্থ। কিন্তু স্বার্থের এই জগতে এমন একটি সম্পর্ক মানুষের আছে যা কোনো স্বার্থের ধার ধারে না। যে সম্পর্ক কৃত্রিমতাবর্জিত, নির্ভেজাল এবং খাঁটি। সেই সম্পর্কটি হচ্ছে পিতা পুত্রের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আন্তরিকতার, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার এবং আস্থার।

পিতা পুত্রের সম্পর্ক যত গভীর হয় তাদের পরস্পরের ভাষাও তত মার্জিত ও পরিশীলিত হয়। পিতার প্রতি পুত্রের সম্মানজনক ভাষা পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। পিতার স্নেহ মাখা আন্তরিক কথাবার্তা সন্তানকে পিতার ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর করে তোলে। পিতা-মাতা সন্তানের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। অপরদিকে নেককার সন্তান পিতা মাতার জন্য সাদাক্বায়ে জারিয়া।

পিতা মাতার সাথে সন্তানের আচরণ কেমন হবে, কথোপকথনের ভাষা কেমন হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা কুরআনুল কারীমে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَ لَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا﴾

"তোমার রব তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা না করতে এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। তাদের একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলো না এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না এবং সম্মানসূচক নম্র কথা বলো।"[১]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন এ উপদেশের সাথে সাথে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় জগৎবাসীর জন্য পিতা পুত্রের কথোপকথনের আদর্শ ভাষা কেমন হবে তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম) তাঁর মুশরিক পিতার সাথে যে মার্জিত ভাষায় বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই সকল যুগের সন্তানদের জন্য অনুকরণীয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَ اذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ
قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِىْ
عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ
فَاتَّبِعْنِىْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ
يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ
اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ
وَ اهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ
كَانَ بِىْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَ اَعْتَزِلُكُمْ وَ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ
اَدْعُوْا رَبِّىْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا﴾

"বর্ণনা করো এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল: হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখে না এবং তোমার কোনো কাজে আসে না তুমি তার 'ইবাদত করো কেন? হে আমার পিতা! আমার নিকটতো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ করো, আমি তোমায় সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের 'ইবাদত করো না; শয়তান আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা

★সহকারী শিক্ষক, উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

[১] সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল: ২১।

সূচীপত্র

করি, তোমাকে আল্লাহর শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে। পিতা বলল: হে ইব্‌রা-হীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইব্‌রা-হীম বলল: তোমার নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের 'ইবাদত করো তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার রবের আহ্বান করি; আশা করি আমার রবের আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হব না।"[১]

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য জ্ঞান পাওয়ার পরও পথভ্রষ্ট পিতার এমন ভয়াবহ হুঙ্কার ও গর্জন শুনেও ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম) দৃঢ় ও শান্তভাবে মমতামাখানো ভাষায় বললেন, "আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার রবের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা চাইবো, তিনি আমার প্রতি মেহেরবান।"

মহান আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ইব্‌রা-হীম (আলায়হিস সালাম) তার পিতার সাথেই শুধু এমন মর্যাদা পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন তা নয়; বরং পরম আদরের পুত্র ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম)-কে আল্লাহপাকের এক কঠিন নির্দেশ অত্যন্ত কোমল ভাষায় নিম্নোক্ত আয়াতের জানিয়ে দেন–

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیْۤ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ﴾

"অতঃপর কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলে একদিন তার পিতা তাকে বললো, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী? সে বললো, হে পিতা! যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। ইন্ শা-আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।"[২]

জীবন উৎসর্গ করে মহান আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে পিতার আনুগত্য প্রদর্শনের এমন বিনয়ী ভাষার ব্যবহার সত্যিই বিস্ময়কর। কিয়ামত পর্যন্ত এ ঘটনা অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) মহান আল্লাহর একজন নবী। তিনি একজন পিতা। আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃপায় তিনি অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ইউসুফ (আলায়হিস সালাম)-কে নিয়ে তার সৎ ভাইদের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচারের বিষয়টি তিনি বুঝতে পেরেও দুর্মতি সন্তানদের সাথে যে রুচিশীল, মার্জিত ও হিকমতপূর্ণ ভাষায় কথা বলেছেন তা অতুলনীয়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالُوْا یٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰی یُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿۱۱﴾ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا یَّرْتَعْ وَ یَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱۲﴾ قَالَ اِنِّیْ لَیَحْزُنُنِیْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنْ یَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳﴾ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ﴾

"ওরা বললো, হে পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করছেন না কেন? আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি আগামীকাল আমাদের সাথে তাকে পাঠান। সে ফলমূল খাবে এবং খেলবে। আমরাই তার দেখাশোনা করব। তিনি বললেন, তোমাদের সাথে গেলে তা আমাকে কষ্ট দিবে এবং আমি আশঙ্কা করি তোমরা অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলবে। ওরা বললো, আমরা ভারী দল থাকা সত্ত্বেও নেকড়ে খেয়ে ফেলবে তাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।"[৩]

এই মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী সন্তানদের কথা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

﴿قَالُوْا یٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا یُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صٰدِقِیْنَ﴾

"ওরা বললো, হে আমার পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম। ইউসুফকে মালপত্রের নিকটে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর বাঘে তাকে খেয়ে

---

[১] *সূরা মারইয়াম: ৪১-৪৮।*
[২] *সূরা আস্-সা-ফ্‌ফা-ত: ১০২।*
[৩] *সূরা ইউসুফ: ১১-১৪।*

ফেলেছে। আমাদের বিশ্বাস করবেন না আমরা সত্যবাদী।"[১]

ছেলেদের এমন সাজানো গল্প বুঝতে পারার জ্ঞান তার ছিল। প্রিয়তম পুত্র ইউসুফকে নিয়ে চক্রান্ত তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু চক্রান্তকারী সন্তানদের কথোপকথনের ক্ষেত্রে উত্তম ভাষা ব্যবহার করেছেন। ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম)-এর উক্তি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তুলে ধরেছেন–

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ﴾

"সে বললো তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছো। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারন আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল।"[২]

ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) তার দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না জেনেও তিনি বললেন,

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ﴾

"তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না ভাবলে আমি বলব আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।"[৩]

ইউসুফ (আলায়হিস সালাম)-কে হারিয়ে ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ইউসুফের সৎ ভাইদের কথায় ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) মনোপীড়ায় জর্জরিত হলেও তাদের প্রতি রূঢ় ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করেননি। তিনি ধৈর্যের সাথে পাপী সন্তানদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿۹۵﴾ فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚۙ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۶﴾ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿۹۷﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"তারা বললো, আল্লাহর শপথ, আপনি তো পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। পরে যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো তার চেহারার ওপর ইউসুফ কর্তৃক প্রেরিত জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) বলেন, আমি কি বলিনি, আমি আল্লাহ হতে যা জানি তোমরা তা জানো না। ওরা বললো, হে পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চান। আমরা অবশ্যই দোষী। ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) বললেন, আমি প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইবো, তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।"[৪]

মিথ্যা শপথকারী বিভ্রান্ত সন্তানদের উপর্যুপরি মিথ্যাচারের বিপরীতে একজন পিতার এমন ধৈর্যশীল ভাষা ব্যবহার এবং ভুলের জন্য অনুতপ্ত পুত্রদের পক্ষে ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট প্রার্থনা করা বিশ্ববাসীর জন্য এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

সন্তানকে ইসলামের মৌলিক বিষয় শিক্ষাদানের ভাষা সহজ ও সাবলীল হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে দেখিয়েছেন, কীভাবে একজন পিতা তার পুত্রকে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন। লুক্বমান (আলায়হিস সালাম) তার পুত্রের নিকট স্পষ্ট ভাষায় উপদেশের বিষয়টি বলেছেন–

﴿وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

"হে আমার পুত্র! তুমি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করো না; নিশ্চয়ই শির্‌ক একটি বড় ধরনের যুল্‌মের কাজ।"[৫]

উপর্যুক্ত কথোপকথনের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের সাথে পিতার ভাষা হবে রুচিশীল, হিকমতপূর্ণ, স্পষ্ট, আন্তরিকতা ও মমতায় ভরপুর। অপরদিকে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের ভাষা হবে বিনয় ও নম্রতায় মোড়ানো, সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ রুচিশীল ও শৈল্পিক।

[১] *সূরা ইউসুফ: ১৭।*
[২] *সূরা ইউসুফ: ১৮।*
[৩] *সূরা ইউসুফ: ৯৪।*
[৪] *সূরা ইউসুফ: ৯৫-৯৮।*
[৫] *সূরা লুক্বমা-ন: ১৩।*

জান্নাত: পরিচয়, উদ্দেশ্য ও প্রতিশ্রুতি

মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা★

ইসলামি 'আক্বিদাহ্ ও শরীয়তের দৃষ্টিতে জান্নাত হলো মহান আল্লাহর আনুগত্যকারী বান্দাদের জন্য পরকালে প্রস্তুতকৃত শান্তির চিরন্তন আবাসস্থল। আরবি 'জান্নাত' (اَلْجَنَّةُ) শব্দের মূল অর্থ ঘন উদ্যান বা বাগান, যা তার ভেতরের সবকিছুকে আবৃত করে রাখে।[১] শরীয়তের পরিভাষায়, জান্নাত হলো সেই পরম নিয়ামতপূর্ণ স্থান, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য পরকালীন অনন্ত প্রতিদান হিসেবে তৈরি করে রেখেছেন।[২]

১. জান্নাতের পরিচিতি ও স্বরূপ: জান্নাত হলো বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সকল সুখ-শান্তির অবিনশ্বর ও চূড়ান্ত রূপ। বিশুদ্ধ 'আক্বিদাহ্ অনুযায়ী, জান্নাত বর্তমানেই সৃষ্ট অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং তা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়; বরং একটি বাস্তব ও চিরস্থায়ী আবাস।[৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতের নিয়ামতের অতুলনীয় বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে কুদসীতে বলেন:

قَالَ اللّٰهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও কখনো জাগ্রত হয়নি।"[৪]

ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত বুখারী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী-তে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, জান্নাতের সুখ-সম্পদ মানুষের অনুভূতি ও কল্পনার সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে। দুনিয়াতে মানুষ যত সুন্দর বস্তুই দেখুক বা কল্পনা করুক না কেন, জান্নাতের প্রকৃত নিয়ামত তার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও গুণগতভাবে ভিন্ন।[৫] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, জান্নাতের বিশালতা সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيْمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ.

অর্থ: "জান্নাতীদের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ের যে ব্যক্তি, সে তার বাগান, স্ত্রী, নিয়ামত, সেবক ও সিংহাসন এক হাজার বছরের দূরত্বের পথ পর্যন্ত দেখবে।"[৬]

আল্লামা মুবারকপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) তুহফাতুল আহওয়াযী-তে বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীকেও এত অসীম দৃষ্টিশক্তি ও বিশাল সাম্রাজ্য দান করবেন যে, সে এক হাজার বছরের পথ বিস্তৃত অঞ্চল একনজরে অতি সহজে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।[৭]

২. জান্নাতের প্রতিশ্রুতির মূল উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা: আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়াতে পরীক্ষাস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ﴾

অর্থ: "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, 'আমলের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল।"[৮]

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অবহেলায় ছেড়ে দেওয়ার

★ *সাবেক সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান, আহলে হাদীস লাইব্রেরি, ঢাকা এবং পরিচালক, উসওয়া পাবলিকেশন্স।*

[১] *লিসানুল আরব- ইবনুল মানযূর, প্রকাশনী: দারুল হাদীস, কায়রো, কায়রো সংস্করণ, প্রকাশকাল: ২০০৩, খণ্ড ১৩, পৃ. ৯২।*

[২] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- অনুবাদ ও সম্পাদনা: অধ্যাপক ডক্টর মুজিবুর রহমান, ১ম সংস্করণ: ২০০০, প্রকাশনী: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, খণ্ড ১, পৃ. ১৮২।*

[৩] *শারহুল 'আক্বীদাহ্ আত-তহাবিয়্যাহ- মূল: আল্লামা আবূ জাফর আত-ত্বাহাভী, ব্যাখ্যা: ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী, অনুবাদক: উস্তায 'আব্দুল্লাহ মাহমুদ, ১ম সংস্করণ-২০২৫, প্রকাশনী: বিলিভার্স ভিশন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ৪৭৫।*

[৪] *সহীহ বুখারী- হা. ৩২৪৪; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮২৪।*

[৫] *ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহিল বুখারী, আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী, প্রকাশনী: দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: ১৩৭৯ হি., খণ্ড ৬, পৃ. ৩১৮।*

[৬] *জামে আত-তিরমিযী- হা. ২৫৫৩, হাসান।*

[৭] *তুহফাতুল আহওয়াযী বি-শারহি জামিআত-তিরমিযী- আল্লামা 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, প্রকাশনী: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ-১৯৯০, খণ্ড ৭, পৃ. ২৫৪।*

[৮] *সূরা আল-মুলক: ২।*

জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং জীবনের আসল উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর আদেশের আনুগত্য ও 'ইবাদতের মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়া। জান্নাত হলো সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের চূড়ান্ত পুরস্কার।[১]

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞাগুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিচে আলোচনা করা হলো—

ক. বান্দার আনুগত্যের ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান: দুনিয়াতে মহান আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও আত্মত্যাগের সঠিক ও উত্তম মূল্যায়ন প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

অর্থ: "সৎকাজের প্রতিদান সৎকাজ (জান্নাত) ছাড়া আর কী হতে পারে?"[২]

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীরে লিখেন, প্রথম 'ইহসান' হলো বান্দার তাওহীদের স্বীকৃতি ও সৎ 'আমল, আর দ্বিতীয় 'ইহসান' হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত ও পরম সুখের প্রতিদান।[৩]

খ. বান্দাকে সৎকাজে উৎসাহিত করা: মানুষের স্বভাবজাত বাসনা হলো উত্তম প্রতিদান পাওয়া। জান্নাতের সুসংবাদ মানুষকে ধৈর্য, তাক্বওয়া ও নেক 'আমলে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে। ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের বর্ণনা দিয়ে বান্দাকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহের উর্ধ্বে উঠে আখিরাতের চিরস্থায়ী সাফল্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন।[৪]

গ. মহান আল্লাহর অসীম রহমত ও ফযল প্রকাশ: জান্নাত মূলত মানুষের 'আমলের মূল্যে অর্জিত হয় না; বরং এটি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের ফসল। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، قَالُوْا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ.

অর্থ: "তোমাদের কাউকেই তার 'আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না।" সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আরয করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও নয়?" তিনি বললেন: "আমাকে নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ দিয়ে আবৃত করেন।"[৫]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) শারহু সহীহ মুসলিম-এ বলেন, 'আমল হলো জান্নাতে প্রবেশের বাহ্যিক মাধ্যম বা শর্ত, কিন্তু প্রকৃত জান্নাত প্রাপ্তি কেবলই মহান আল্লাহর দয়া ও ফযলের ওপর নির্ভরশীল।[৬]

ঘ. ইনসাফ ও পরম বিচার প্রতিষ্ঠা: দুনিয়াতে পাপাচারী ও সৎকর্মশীলদের পরিণতি এক হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ﴾

অর্থ: "আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?"[৭]

আল্লামা আশ-শানকীতী (রাহিমাহুল্লাহ) আদওয়াউল বায়ান-এ লেখেন, ন্যায়বিচারের দাবি হলো সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার প্রাপ্য পুরস্কার পাবে এবং অপরাধী তার শাস্তি পাবে; জান্নাতই ইনসাফের বাস্তব রূপায়ন।[৮]

৩. কুরআন মাজীদে বর্ণিত জান্নাতের প্রতিশ্রুতি: কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াতে ঈমানদারদের জান্নাতের স্পষ্ট ও সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ক. ঈমান ও সৎকর্মের মহা বিনিময়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

---

১ *তাফসীরে ইবনু কাসীর- অনুবাদ ও সম্পাদনা: অধ্যাপক ডক্টর মুজিবুর রহমান, ১ম সংস্করণ-২০০০, প্রকাশনী: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, খণ্ড ১০, পৃ. ১৪১।*

২ *সূরা আর্-রহমা-ন: ৬০।*

৩ *তাফসীরে আল-কুরতুবী- (আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন), ইমাম কুরতুবী, প্রকাশনী: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ২য় সংস্করণ-২০০৬, খণ্ড ১৭, পৃ. ১৭৫।*

৪ *তাফসীরে আত-তাবারী- (জামিউল বায়ান), ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, প্রকাশনী: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ-২০০০, খণ্ড ১, পৃ. ৩৯২।*

৫ *সহীহ বুখারী- হা. ৫৬৭৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮১৬।*

৬ *শারহু সহীহ মুসলিম (আল-মিনহাজ)- ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আল-নববী, প্রকাশনী: দারুল খাইর, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ-১৯৯৬, খণ্ড ১৭, পৃ. ১৫৭।*

৭ *সূরা আল-কলম: ৩৫।*

৮ *আদওয়াউল বায়ান ফি ইদাহিল কুরআন বিল কুরআন- আল্লামা মুহাম্মদ আল-আমীন আশ-শানকীতী, প্রকাশনী: দারুল আলম আল-ফুওয়াইদ, মক্কা, সৌদি আরব, খণ্ড ৮, পৃ. ২৫২।*

অর্থ: "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে ফেরদাউস জান্নাত।"[১]

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন, 'জান্নাতুল ফেরদাউস' হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর, যার ওপরে সরাসরি মহান আল্লাহর আরশ বিদ্যমান। খাঁটি ঈমান ও সুন্নাহসম্মত সৎকাজের মাধ্যমে বান্দা এই স্তর লাভ করতে পারে।[২]

খ. চিরস্থায়ী আবাস ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

অর্থ: "আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন জান্নাতের, যার তলদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্থায়ী জান্নাতে পবিত্র বাসস্থানের। আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় কথা; এটাই হলো মহা সাফল্য।"[৩]

ইমাম আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাফসীরে আত-তাবারীতে লিখেছেন, জান্নাতের সুন্দর প্রাসাদ ও নহরসমূহের চেয়েও সবচেয়ে বড় মর্যাদা ও নিয়ামত হলো বান্দার ওপর রবের 'রিদ্বওয়ান' বা সন্তুষ্টি লাভ, যার পর আর কোনো ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি নেই।[৪]

গ. জান্নাতের সীমানা ও প্রশস্ততা: আল্লাহ বলেন,

﴿وَسَارِعُوْا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

অর্থ: "আর তোমরা দ্রুত ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।"[৫]

আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর আহকামুল কুরআন-এ উল্লেখ করেন, আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার উদাহরণ দিয়ে জান্নাতের অসীম পরিসীমা বুঝানো হয়েছে, যাতে বান্দারা অলসতা ছেড়ে দ্রুত তাওবাহ্ ও নেক 'আমলের দিকে ধাবিত হয়।[৬]

৪. সুন্নাহর আলোতে জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাত লাভের উপায়: হাদীসে জান্নাতের স্বরূপ, সেখানকার নিয়ামত ও সেখানে প্রবেশের সহজ মাধ্যমসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক. পরম আনন্দ ও মহান আল্লাহর চিরন্তন সন্তুষ্টি: আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُوْلُوْنَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُوْلُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের বলবেন, 'হে জান্নাতবাসী!' তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা হাজির।' আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি বর্ষণ করলাম, এরপর আমি আর কখনো তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না'।"[৭]

কাযী ইয়াজ (রাহিমাহুল্লাহ) ইকমালুল মু'লিম-এ উল্লেখ করেন, এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে জান্নাতে মহান আল্লাহর অফুরন্ত অনুকম্পা লাভই মু'মিনের পরম চাওয়া এবং সেখানে অসন্তুষ্টির সমস্ত ভয় চিরতরে দূর হয়ে যাবে।[৮]

খ. মৃত্যু ও বার্ধক্যের অবসান: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

يُنَادِيْ مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشَابُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبَدًا.

অর্থ: "এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে: 'তোমাদের জন্য নিশ্চয়তা রইল যে তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ

---

[১] *সূরা আল-কাহ্‌ফ: ১০৭।*

[২] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- অনুবাদ ও সম্পাদনা: অধ্যাপক ডক্টর মুজিবুর রহমান, ১ম সংস্করণ-২০০০, প্রকাশনী: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৪।*

[৩] *সূরা আত-তাওবাহ: ৭২।*

[৪] *তাফসীরে আত-তাবারী (জামিউল বায়ান)- ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, প্রকাশনী: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ-২০০০, খণ্ড ১৪, পৃ. ৩৩৩।*

[৫] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৩৩।*

[৬] *আহকামুল কুরআন- আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস, প্রকাশনী: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ-১৯৯৪, খণ্ড ২, পৃ. ৩২৭।*

[৭] *সহীহ বুখারী- হা. ৬৫৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৮২৯।*

[৮] *ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়াইদি মুসলিম- কাযী ইয়াজ ইবনু মুসা, প্রকাশনী: দারুল অফা, মনসুরা, মিসর, ১ম সংস্করণ-১৯৯৮, খণ্ড ৮, পৃ. ৩৭৬।*

হবে না; তোমরা জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না; তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না'।"[১]

ইমাম আল-কুরতুবী (রাহিমাহুল্লা-হ) তাঁর আল-তাযকিরাহ গ্রন্থে লেখেন, দুনিয়ার প্রধান চারটি কষ্ট− রোগ, বার্ধক্য, মৃত্যু ও শোক জান্নাতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকবে এবং জান্নাতবাসী অনন্ত যৌবন উপভোগ করবে।[২]

গ. জান্নাতে প্রবেশের সহজ 'আমল: 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

অর্থ: "হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘরাও, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করো; তাহলে তোমরা শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩]

ইমাম ইবনু রজব আল-হানবালী (রাহিমাহুল্লা-হ) জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম-এ বলেন, এই হাদীসে সামাজিক ও আত্মিক চারটি সহজ 'আমলের কথা বলা হয়েছে, যা সমাজকে সুসংগঠিত করে পরম শান্তিতে জান্নাত লাভের পথ সুগম করে।[৪]

৫. জান্নাত সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের 'আক্বিদাহ্ ও ব্যাখ্যা: ইসলামের প্রখ্যাত আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জান্নাতের বিষয়ে 'আক্বিদাহ্গত স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন:

ক. ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (রাহিমাহুল্লা-হ): জান্নাতে মু'মিনের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি (রিদ্বওয়ান)।[৫]

খ. ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লা-হ): জান্নাত কোনো রূপক বিষয় নয়; বরং তা একটি বাস্তব স্থান, যেখানে কষ্ট ও মৃত্যুর অবসান ঘটবে।[৬]

গ. ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লা-হ): জান্নাত বর্তমানেই সৃষ্ট অবস্থায় মহান আল্লাহর আরশের নিচে বিদ্যমান এবং তা চিরকাল অবশিষ্ট থাকবে, কখনো ধ্বংস হবে না।[৭]

ঘ. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ): সহীহ বুখারীতে জারীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোকে জান্নাতে মু'মিনদের জন্য সবচেয়ে মহান নিয়ামত হলো স্বচক্ষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পবিত্র দর্শন (দীদার) লাভ করা।[৮]

উপসংহার: জান্নাত হলো পরকালে মহান আল্লাহর আনুগত্যের চূড়ান্ত সাফল্য ও মু'মিনের আসল গন্তব্য। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

অর্থ: "কালের কসম! নিশ্চয় মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্ততায় রয়েছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"[৯]

ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, মানুষ যদি কেবল এই সূরা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত, তবে এটিই তাদের হিদায়াত ও জান্নাত অর্জনের পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট হতো।[১০]

দুনিয়ার সাময়িক জীবনের পরীক্ষা ও ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অর্জনে সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে সঠিক ঈমান ও নেক 'আমল করাই প্রতিটি মুসলিমের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

---

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৩৭।*

[২] *আল-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাউতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ- ইমাম কুরতুবী, প্রকাশনী: দারুল মিনহাজ, জেদ্দা, সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ-২০০৪, পৃ. ৫১৮।*

[৩] *জামে আত-তিরমিযী- হা. ২৪৮৫, হাসান সহীহ।*

[৪] *জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম, ইবনু রজব আল-হানবালী, প্রকাশনী: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, ৭ম সংস্করণ-১৯৯৮, পৃ. ৩৮৪।*

[৫] *তাফসীরে আত-তাবারী (জামিউল বায়ান)- ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, প্রকাশনী: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ-২০০০, খণ্ড ১৪, পৃ. ৩৩৩।*

[৬] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- অনুবাদ ও সম্পাদনা: অধ্যাপক ডক্টর মুজিবুর রহমান, ১ম সংস্করণ-২০০০, প্রকাশনী: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, খণ্ড ৪, পৃ. ২৬৭।*

[৭] *মাজমুউল ফাতাওয়া- শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, প্রকাশনী: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রকাশকাল: ২০০৪, খণ্ড ১৮, পৃ. ৩০৭।*

[৮] *হাদীউল আরওয়াহ ইলা বিলাহিল আফরাহ- আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ, প্রকাশনী: দারুল আছাম্মা, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ-১৯৯৩, পৃ. ২০৪; সহীহ বুখারী- হা. ৭৪৩৪।*

[৯] *সূরা আল-আস্‌র: ১-৩।*

[১০] *তাফসীরে ইবনু কাসীর- অনুবাদ ও সম্পাদনা: অধ্যাপক ডক্টর মুজিবুর রহমান, ১ম সংস্করণ-২০০০, প্রকাশনী: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, খণ্ড ১০, পৃ. ৫৮৭।*

التربيةوالحضارة / শিক্ষা ও সভ্যতা

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পঞ্চম (শেষ) পর্ব]

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক গবেষণার (যেমন- Credit Suisse Research Institute এবং Oxfam-এর প্রতিবেদনের) ভিত্তিতে জানা যায়, বিশ্বের শীর্ষ ১০% ধনী মানুষের কাছে বিশ্বের প্রায় ৭৫% মোট ব্যক্তিগত সম্পদ রয়েছে। শীর্ষ ১% ধনী মানুষের কাছে বিশ্বের প্রায় ৪৫% সম্পদ রয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বের নীচের ৫০% মানুষ মিলেও বিশ্বের মোট সম্পদের ২% বা তার কম অংশের মালিক। অথচ ইসলাম সম্পদ জমা করা বা হিসেব করাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। সম্পদ যাতে পুঞ্জিভূত না হয় সে কারণে সতর্কবাণী বিঘোষিত হয়েছে যে, "যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে।" বলা হবে,

﴿هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ﴾

"এটাই সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন করো।"[1]

অনুরূপ অসংখ্য সাবধানবাণী-কুরআনুল কারীম[2] ও রাসূল (ﷺ)-এর বাচনিক উদ্ধৃতিতে[3] পাওয়া যায়। পুঁজিবাদী সমাজে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার ঘৃণ্যনীতির অনুমতি ইসলামে নেই। বস্তুত ইসলাম সংযম (ইতিদাল), কৃতজ্ঞতা (শুকর) এবং দায়িত্বশীল ভোগের শিক্ষা দেয়। সম্পদ পুঞ্জিভূত করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, সহিংসতা, পর্নোগ্রাফি এবং পারিবারিক ভাঙ্গণ, আধুনিক সমাজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলাম সততা, লজ্জাশীলতা, আমানতদারিতা ও পারিবারিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে এসব সমস্যার প্রতিকার নির্দেশ করে। কুরআনুল কারীমে সততা, লজ্জাশীলতা ও আমানতদারিতা প্রতিপালন ও অগ্রাহ্যের বিষয়ে সাবধানতা উচ্চারিত হয়েছে। উল্লেখ আছে–

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ﴾ ﴿۳۰﴾

﴿وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ﴾

"মু'মিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। আর মু'মিন নারীদেরও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"[4] আর আমানত প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে,

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানতসমূহ যথাযথভাবে তাদের হক্বদারদের কাছে পৌঁছে দেবে।"[5] বর্তমান যুগে আমানতের খেয়ানত মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ﴾

"আর তারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।"[6] উল্লেখ্য, গুণদু'টিই একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তি। হাদীসগ্রন্থে এই দুইগুণের ওপর বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার অপরাধ, ভুয়া তথ্য (Fake News) ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার এবং ডিজিটাল নজরদারি নতুন ধরনের নৈতিক ও আইনি সংকট সৃষ্টি করেছে। প্রযুক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহার না হলে সমাজ বিধ্বংসী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সাম্প্রতিককালে ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েল যুদ্ধে তার প্রতিফলন দেখা যায়। সরকারি বাজেটের ১৩% আমেরিকা, ২০%

---

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, সোস্যাল সায়েন্স ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

[1] সূরা আত্-তাওবাহ্: ৩৫।

[2] সূরা আল-হাশ্‌র: ৭; সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৮০।

[3] জামে আত্ তিরমিযী; সহীহ মুসলিম।

[4] সূরা আন্-নূর: ৩০ ও ৩১।

[5] সূরা আন্-নিসা: ৫৮।

[6] সূরা আল-মু'মিনূন: ৮; সূরা আল-মা'আরিজ: ৩২।

ইসরায়েল ও ৮% ইরান বরাদ্দ দেয়।[১] এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি ও তার ব্যবহার উপগ্রহটিকে বারুদময় করে তুলেছে। গাজায় নিক্ষিপ্ত বোমায় প্রায় ৯০,০০০ লোকের প্রাণহানি বিশ্বকে হতবাক করে তুলেছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার করে নির্মিত পারমানবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা ছাড়া আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ক্লাস্টার মিউনিশন, ড্রোন বা মানববিহীন যুদ্ধবিমান প্রভৃতি সভ্যতার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সম্পদের অসমবন্টন, দারিদ্র, বেকারত্ব এবং সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। ইসলাম যাকাত, সাদাক্বাহ্, ওয়াক্ফ এবং ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাসের পথ নির্দেশ করে। পরিবেশ দূষণ, বন উজাড়, বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। শুধুমাত্র সৌদি আরবে প্রতিবছর প্রায় ৪.০-৪.১ মিলিয়ন টন খাদ্য অপচয় হয়। একটি তথ্যে জানা যায় যে, দেশটিতে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ৩৩% অপচয় হয়। এ ধরনের খাদ্য অপচয় রোধের মাধ্যমেই খাদ্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা বিরাজমান। চরমপন্থার সঙ্গে ইসলামের অযৌক্তিক সম্পৃক্ততা এবং ইসলামফোবিয়া সমাজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা, গবেষণা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এই সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, সমন্বিত চিন্তার বিকাশই হলো সভ্যতা। নীতি বিবর্জিত সভ্যতা সমাজের কাজে আসে না, বরঞ্চ সৃষ্ট অস্থিরতার কারণে সভ্যতার প্রকরণ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ইসলামে নৈতিক শিক্ষা সংবলিত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবীকে সবুজ ও বাসযোগ্য রাখা মানুষের অন্যতম দায়িত্ব।[২] বৃক্ষরোপণ সাদাক্বায়ে জারিয়া মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোনো মুসলিম যদি একটি গাছ রোপণ করে অথবা কোনো ফসল ফলায়, অতঃপর তা থেকে মানুষ, পাখি বা পশু ভক্ষণ করে, তবে তার জন্য সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩] পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা আমরা আরো কতিপয় হাদীসে দেখতে পাই। রাসূল (ﷺ) বলেন, "যদি কিয়ামত সংঘটিত হতে থাকে এবং তোমাদের কারো হাতে একটি চারা গাছ থাকে এবং সে তা রোপণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে যেন তা রোপণ করে।"[৪] হাদীসটি পরিবেশ সংরক্ষণের অনন্য শিক্ষা বহন করে। যে গাছ পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন, তা কিন্তু সহসা কর্তন করা যায় না। এতদমর্মে রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি অকারণে একটি সিদর (ছায়াদানকারী) গাছ কেটে ফেলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দিকে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।"[৫] ইসলাম সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ন্যায়ভিত্তিক সহবস্থানের শিক্ষা দেয়। ইসলাম মত পার্থক্যের মধ্যেও ধৈর্য-সংযম ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে–

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾

"ক্ষমা অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"[৬] অনুরূপ উৎসাহব্যঞ্জক আরো কতিপয় হাদীসে আমরা জানতে পাই যে, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।"[৭] এতে মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহনশীল আচরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

এছাড়াও পারস্পরিক ভালোবাসা ইসলামের মৌলিক চেতনার ধারক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না এবং একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না।"[৮] অনুরূপ ইঙ্গিতবাহী নির্দেশনা রাসূল (ﷺ)-এর বাচনিক উদ্বৃতিতে পাওয়া পাওয়া যায়। তিনি (ﷺ) বলেন, "মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।"[৯] শ্রদ্ধাবোধের এমন নজীর আর কোনো ধর্মে দৃষ্ট হয় না।

ন্যায়ভিত্তিক সহাবস্থান ইসলামের অনন্য অবদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[১] ২০২৪ অর্থবছর।

[২] সূরা আল-বাক্বারাহ্: ৩০, সূরা আল-আন'আম: ১৪১, সূরা আল-আ'রাফ: ৩১, ৫৬, সূরা হূদ: ৬১, সূরা ইব্রা-হীম: ৩২-৩৪, সূরা আন্-নাহ্ল: ১০-১১, সূরা আর্-রূম: ৪১, সূরা লুক্মা-ন: ২০, সূরা আর্-রহ্মা-ন: ৭-৯, সূরা আল-মুল্ক: ১৫, সূরা আবাসা: ২৪-৩২।

[৩] বুখারী- ২৩২০; মুসলিম- ১৫৫০।

[৪] মুসনাদ আহমদ- ১২৯০২।

[৫] আবূ দাউদ- ৫২৩৯।

[৬] সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৯।

[৭] বুখারী- ৭৩৭৬; মুসলিম- ২৩১৯।

[৮] সূরা আল-হুজুরা-ত: ১১।

[৯] বুখারী- ১০; মুসলিম- ৪০।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর; এটাই তাক্বওয়ার নিকটবর্তী।"[১]

ইসলামি অর্থনীতির যাকাত, ওয়াক্ফ, সুদমুক্ত অর্থায়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতিগুলো অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামি অর্থনীতি কেবল সম্পদ অর্জনের ব্যবস্থা নয়; বরং এটি ন্যায়, ভারসাম্য মানবকল্যাণ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি চমৎকার মাধ্যম। কুরআনুল হাকীমে পাওয়া যায়,

﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দাও।"[২] আরো উল্লেখ রয়েছে–

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

"তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের নির্ধারিত অধিকার রয়েছে।"[৩] ইত্যকার আয়াতসমূহে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতির নির্দেশনা পাওয়া যায়।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শালীনতা আনা যায়। ইসলামের প্রথম নির্দেশ ছিল 'পড়ো'। তাই শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মুসলিম সমাজ আবারও বিশ্বসভ্যতায় গঠনমূলক অবদান রাখতে পারে। সততা, ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীলতা ও মানবকল্যাণ-আধুনিক সভ্যতার নৈতিক সংকট মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার সহসাই সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে। ইসলাম জ্ঞান ও গবেষণাকে উৎসাহিত করে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধ ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় সম্ভব। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা SDG-এর সঙ্গে ইসলামের অনেক নীতি দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক কল্যাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাকাত, সাদাক্বাহ্ ও ওয়াক্ফ সম্পদ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানে সমূহ ভূমিকা পালন করে থাকে। অক্সিজেননির্ভর সবুজ পৃথিবী বিনির্মাণে ইসলামের নীতিমালা বড়ই আগ্রহব্যঞ্জক ও আশাপ্রদ।

ইসলাম পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসে বৃক্ষরোপণকে সওয়াবের কাজ এবং অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষ কর্তনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে–

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

"তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তোমাদেরকে আবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।"[৪]

আন্তঃসভ্যতা সংলাপ পরস্পরের সাথে নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে সংঘাতের পরিবর্তে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংলাপের প্রয়োজন। ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে এবং শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করতে সহায়ক হতে পারে।

সমকালীন বিশ্বে ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার সম্পর্ক সংঘাতের নয়; বরং নৈতিক সমন্বয় ও গঠনমূলক সহযোগিতার। আধুনিক সভ্যতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানবজীবনে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এনেছে। আর ইসলাম সেই অগ্রগতিকে ন্যায় বিচার, মানব মর্যাদা, নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে পরিচালিত করার দিক নির্দেশনা প্রদান করে। তাই বস্তুগত উন্নয়নের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও টেকসই বিশ্বসভ্যতা গঠনে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। তাওহীদী চেতনার নির্যাস হচ্ছে মানবকল্যাণ। মানব কল্যাণের ব্রত স্রষ্টার প্রতি সমর্পণ। আর এখানেই নিহিত সমস্ত শক্তি ও ভালোবাসা। এ সকল কারণেই ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা, মূল্যবোধের সংলাপ এবং মানবকল্যাণের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের আলোকে মূল্যায়ণ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

---

[১] সূরা আল-মায়িদাহ্: ৮।
[২] সূরা আন্-নূর: ৩৩।
[৩] সূরা আয্-যা-রিয়া-ত: ১৯।
[৪] সূরা হূদ: ৬১।

সূচীপত্র

قصص القرآن / ক্বাসাসুল কুরআন

মাছের পেটে ইউনুস (আলায়হিস সালাম)

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

ইউনুস (আলায়হিস সালাম) একজন সম্মানিত নবী। পবিত্র কুরআনে স্বতন্ত্র একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তার নামে- 'সূরা ইউনুস'। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরো ছয়টি সূরায় তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে দু'জন নবী মায়ের নামে পরিচিত হয়েছেন। একজন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম, অন্যজন ইউনুস ইবনু মাত্তা। মাত্তা ইউনুস (আলায়হিস সালাম)-এর মায়ের নাম। মায়ের নামেই তাকে ইউনুস ইবনু মাত্তা বলা হয়। কুরআন মাজিদে তাকে তিনটি নামে উল্লেখ করা হয়েছে– মূল নাম ইউনুস, জুননূন ও সাহিবুল হুত। 'জুননূন' ও 'সাহিবুল হুত'-এর অর্থ মাছওয়ালা। মাছ সংশ্লিষ্ট ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তাকে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনুস (আলায়হিস সালাম) বর্তমান ইরাকের মসুলে অবস্থিত নিনাওয়া নামক জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি মূলত এই আসিরীয় বংশোদ্ভূত ক্বওমকে একত্বের দা'ওয়াত দেন। নিনাওয়াবাসীর পার্থিব সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। প্রাচুর্য, আরাম-আয়েশ ও অভাবমুক্ত জীবন তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি উদাসীন বানিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ধন-ঐশ্বর্য তাদেরকে চরিত্রহীন, অশ্লীলতাপ্রবণ, অহংকারী ও স্বার্থপর করে দিয়েছিল। তারা এক মহান আল্লাহকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মনগড়া মূর্তিকে দেবতা বানিয়ে তার পূজা করতো।

নিনাওয়াবাসীর হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আলায়হিস সালাম)-কে নবী করে প্রেরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত তাদেরকে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাঁর দা'ওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করেনি। উপরন্তু তারা তাঁর দা'ওয়াতে বাধা প্রদান ও তাঁকে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকলো।

দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত বিরুদ্ধাচারণ ও শত্রুতার কারণে ইউনুস (আলায়হিস সালাম) তাঁর জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। ফলে তিনি মনঃকষ্ট নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তিনি মহান আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষা করেননি।

রাতের অন্ধকারে তিনি ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছলেন। নদী পার হওয়ার জন্য অন্যান্য যাত্রীদের সাথে তিনি যখন নৌকায় উঠলেন, তখন হঠাৎ নদী উত্তাল হয়ে উঠলো এবং নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ ঘটনায় মাঝি ও যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে গেল। মাঝি বললো, নিশ্চয় নৌকায় কোনো পলাতক গোলাম রয়েছে, যে মালিকের অনুমতি ছাড়া পালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাকে নৌকা থেকে ফেলে দিলে সব যাত্রী বেঁচে যাবে। পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরে ইউনুস (আলায়হিস সালাম) নিজেই বললেন, আমিই পালিয়ে আসা ব্যক্তি। কিন্তু যাত্রীরা এরূপ সত্যভাষী ও ভদ্রলোককে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তারা তৎকালীন প্রথানুযায়ী লটারির মাধ্যমে অপরাধী চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করলেন। লটারিতে পর পর তিনবার তাঁর নাম উঠায় অবশেষে নিরূপায় হয়ে যাত্রীরা তাঁকে নৌকা থেকে ফেলে দিলো। অতঃপর যাত্রীরা নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছল।

এদিকে মহান আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট মাছ ইউনুস (আলায়হিস সালাম)-কে আস্ত গিলে ফেললো। মাছের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ছিল, অক্ষতভাবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁকে সংরক্ষণের। আল-কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করেই ইউনুস (আলায়হিস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। নবী হিসেবে মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এমন করা তাঁর জন্য শোভনীয় হয়নি। তাই তাঁকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল।

ঐদিকে ইউনুস (আলায়হিস সালাম)-এর চলে যাওয়ার পর 'আযাব আসার লক্ষণ দেখে তাঁর জাতি ভয় পেয়ে গেল। অতীত নবীগণের উম্মতরা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সংবাদ তারা জেনেছিল। তারা উপলব্ধি করলো যে, তাদের ধ্বংসের জন্য 'আযাব আসা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ধ্বংস হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে তারা অন্যায়, অবিচার, পাপাচার, আল্লাহদ্রোহিতা ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করার অঙ্গীকার করলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ্ কবুল করলেন এবং তাদের

উপর থেকে 'আযাব দূর করে দিলেন। এদিকে ইউনুস (আলায়হিস সালাম) মাছের পেটে অবস্থান করে নিজের অপরাধ স্বীকার করে মহান আল্লাহর দরবারে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন:

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ বা মা'বূদ নেই। তিনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর যুল্ম করেছি।"[১]

এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾

"আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন। 'যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছল। অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হলো। অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার দানকারী।"[২]

ইউনুস (আলায়হিস সালাম)-এর জীবন থেকে শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা কুফ্র, শির্কে লিপ্ত পথভ্রষ্ট জাতিকে হেদায়েতের জন্য সব যুগেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণ মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। যেসব জাতি নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতে মহান আল্লাহর পথ প্রাপ্ত হয়ে হেদায়েত গ্রহণ করেছিলেন, তারা সুন্দর ও সার্থক জীবন লাভকরেছিলেন। আর যেসব জাতি আল্লাহদ্রোহিতা ও হটকারিতার পথ বেঁচে নেয়েছিলেন, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। নিনাওয়াবাসীসহ আদ, সামুদ মাদইয়ান প্রভৃতি জাতির ধ্বংস তারই উদাহরণ।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে সম্মান বা পদ-মর্যাদা দান করে থাকেন এবং প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে তার বিচার করে থাকেন। নবী-রাসূলগণ যেহেতু উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তেমনি তাঁদের সামান্য ভুলও আল্লাহ তা'আলা সহজভাবে গ্রহণ করেন না। যেমন- ইউনুস (আলায়হিস সালাম)-এর সামান্য ইজতিহাদী (নিজস্ব উপলব্ধি ও চিন্তা-গবেষণা) ভুলকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি। ফলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁকে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছে।

৩. ইউনুস (আলায়হিস সালাম) অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়ে কোনো প্রকার অভিযোগ অনুযোগ উত্থাপন করেননি; বরং নিজের মানবিয় দুর্বলতাকে দায়ী করে মহান আল্লাহর দরবারে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করে তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৪. ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ভুল বা অপরাধ করে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ক্ষমা করে দেন।

৫. পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও জলচর প্রাণী সবাই মহান আল্লাহর হুকুমে ঈমানদার ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়। যেমন- মাছ ও লতা জাতীয় গাছ ইউনুসের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

৬. মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দু'আ কবুল হয় না। যেমন- গভীর সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন।

৭. মহান আল্লাহর প্রতিটি কর্ম তার নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। যা বান্দা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে। যেমন- ইউনুস পরে বুঝতে পেরে মহান আল্লাহর প্রতি অধিক অনুগত হন এবং এজন্য তিনি মহান আল্লাহর প্রতি অধিক প্রত্যাবর্তনশীল أَوَّابٌ বলে মহান আল্লাহর প্রশংসা পান।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব– কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।"

(শাইখ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম, ৫০ পৃ:)

[১] *সূরা আল-আম্বিয়া-: ৮৭।*
[২] *সূরা আস্-সা-ফ্ফা-ত: ১৩৯-১৪২।*

أفكار اجتماعية / সমাজ চিন্তা

জিহাদী চেতনা বনাম জঙ্গি তৎপরতা

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

জিহাদ শব্দ শুনলেই অনেকেই মনে করেন, এটি শুধু অস্ত্র বা যুদ্ধ। কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী জিহাদ হলো আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংগ্রাম, যা ন্যায়, কল্যাণ ও মহান আল্লাহর পথ অনুসরণের জন্য। আধুনিক সময়ে কিছু ব্যক্তি জিহাদকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে, যা জন্ম দেয় জঙ্গি তৎপরতা। এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব জিহাদী চেতনা ও জঙ্গি তৎপরতার পার্থক্য। ইসলামে জিহাদ অর্থ শুধু যুদ্ধ নয়; বরং এটি একটি বিস্তৃত ধারণা, যা অন্তর্দৃষ্টি, আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পথে চলাকে বুঝায়। জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ন্যায়, কল্যাণ ও মানুষের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম। সমাজে যখন অবিচার, শির্ক ও কুফ্র বেড়ে যায়, তখন জিহাদ ইসলামের বিধি অনুযায়ী সমাজকে সঠিক পথে ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয়। আধুনিক সময়ে কিছু মানুষ জিহাদকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে যা জন্ম দেয় জঙ্গি তৎপরতা, যেখানে ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক উপেক্ষা করা হয়।

জিহাদের সংজ্ঞা: জিহাদ (جهاد) শব্দের অর্থ, সর্বোচ্চ চেষ্টা ও সাধনা করা। ইসলামে জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়; বরং এটি বহুস্তরবিশিষ্ট একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম।

জিহাদের প্রকারভেদ: জিহাদ প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ: পাপ, লোভ ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মসংযম। এটা সর্বপ্রথম জিহাদ।

২. ‘ইল্‌ম ও দা‘ওয়াতের জিহাদ: সত্যকে জ্ঞান, কলম ও সুন্দর উপদেশে কুরআন ও সুন্নাহ প্রচার করা।

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক জিহাদ: যুল্‌ম প্রতিরোধ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো।

মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

জিহাদী চেতনার বৈশিষ্ট্য: জিহাদী চেতনা হলো– মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের নফস, সমাজ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক, দায়িত্বশীল ও জ্ঞানভিত্তিক সংগ্রামের মানসিকতা।

এটি উগ্রতা, প্রতিশোধ বা নিরপরাধের ক্ষতি নয়; বরং এটি সঠিক নিয়ত, সীমাবদ্ধতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে কল্যাণ আনা।

মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– আল্লাহকেন্দ্রিক বিশুদ্ধ নিয়ত, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক সংগ্রাম, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও নিরপরাধ মানুষের সুরক্ষা, ধৈর্য, সংযম ও দায়িত্বশীলতা।

জিহাদের নিয়ত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হওয়া বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

অর্থ: “বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু; সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।”[১]

জিহাদী চেতনার মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। যদি নিয়ত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয়, তবে কোনো লড়াই গ্রহণযোগ্য নয়। সকল ‘আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল কেননা হাদীসে ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল(ﷺ) বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

অর্থ: “নিশ্চয়ই সব ‘আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।”[২]

এই হাদীস প্রমাণ করে নিয়ত ছাড়া কোনো কাজ জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে না। তাছাড়া আত্মশুদ্ধি হলো জিহাদের প্রথম ধাপ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে।”[৩]

[১] *সূরা আল-আন‘আম: ১৬২।*
[২] *সহীহ বুখারী- ১; সহীহ মুসলিম- ১৯০৭।*
[৩] *সূরা আর্‌-রা‘দ: ১১।*

জিহাদ শুরু হয় নিজের নফস ও চরিত্রের শুদ্ধি থেকে। বাহ্যিক পরিবর্তনের আগে অন্তরের সংস্কার অপরিহার্য। জিহাদ কখন ফর্য হয়, ইসলামি শরীয়তে জিহাদ দু'ভাবে ফর্য হয়। যথা- (১) ফর্যে কিফায়া এবং (২) ফর্যে আইন।

১) ফর্যে কিফায়া হিসেবে জিহাদ: কিছু সংখ্যক যোগ্য মুসলিম তা আদায় করলে বাকিদের ওপর থেকে দায়িত্ব উঠে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً﴾

অর্থ: "আল্লাহ তাদেরকে, যারা নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করে, যারা বসে থাকে তাদের ওপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"[১]

স্বাভাবিক অবস্থায়, বৈধ নেতৃত্ব ও সক্ষমতা থাকলে পর্যাপ্ত লোক অংশ নিলে এটি ফর্যে কিফায়া থাকে। তবে জিহাদের চিন্তা মনে না থাকলে মুনাফিক্ব হিসাবে গন্য হতে হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

অর্থ: "যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে নিজে জিহাদ করেনি এবং অন্তত জিহাদের নিয়ত বা চিন্তাও নিজের মনে পোষণ করেনি সে মুনাফিক্বীর একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করলো।"[২]

২) ফর্যে আইন হিসেবে জিহাদ (কখন সবার ওপর জরুরি হয়): নিম্নোক্ত তিন অবস্থায় জিহাদ ফর্যে আইন হয়ে যায়। অর্থাৎ- যার সক্ষমতা আছে, তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক।

ক) শত্রু আক্রমণ করলে (আত্মরক্ষামূলক জিহাদ): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾

অর্থ: "তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।"[৩]

যখন কোনো ভূখণ্ডে মুসলিমদের ওপর সরাসরি হামলা হয়, তখন আত্মরক্ষার জিহাদ ফর্যে আইন হয়ে যায়। তাকে তখন "দারুল হারব" (যুদ্ধ কবলিত এলাকা) বলা হয়।

খ) বৈধ নেতৃত্ব সাধারণ আহ্বান দিলে: আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

অর্থ: "যখন তোমাদেরকে (সমষ্টিগতভাবে) ডাকা হবে, তখন তোমরা সাড়া দাও।"[৪]

রাষ্ট্র বা বৈধ আমীরের সাধারণ ডাক এলে, শরঈ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, তা ফর্যে আইন হয়।

গ) সরাসরি মুখোমুখি অবস্থায় পড়লে: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ﴾

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি হও, তখন পিঠ দেখিয়ে পালিও না।"[৫]

সরাসরি সংঘর্ষের মুহূর্তে দায়িত্ব ব্যক্তিগত হয়ে যায়। তাতে মৃত্যুবরণ করলে শহিদ।

জঙ্গি তৎপরতার সংজ্ঞা: জঙ্গীবাদ' শব্দটি মূলত আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত পরাশক্তি ও বিশ্বমোড়ল বলে খ্যাত এবং ইসলাম ও মুসলমানের চিরন্তন শত্রু ইহুদী-খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য কর্তৃক চালুকৃত একটি নব্য পরিভাষা। এর দ্বারা তারা শুধুমাত্র মুসলমানদেরকেই বুঝিয়ে থাকে। যদিও উক্ত পরিভাষাটি প্রাচীন 'চরমপন্থা'র সাথে ব্যবহারগত ও কর্মগতভাবে পুরোপুরি সম্পৃক্ত। আর চরমপন্থা হলো কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বন করা। উগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক মধ্যম ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতিকে চরমত্বে আসীন করানোই চরমপন্থা।

জঙ্গি তৎপরতা বলতে বুঝায়, ইসলামের সঠিক নীতি বা সীমা উপেক্ষা করে, ভয়, সহিংসতা, হত্যা এবং ধ্বংসের মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– স্বার্থপর

[১] *সূরা আন্-নিসা: ৯৫।*
[২] *সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ইমারা, হা. ১৯১০।*
[৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯০।*
[৪] *সহীহ বুখারী- ২৯৫৭; সহীহ মুসলিম- ১৮৬৭।*
[৫] *সূরা আল-আনফাল: ১৫।*

উদ্দেশ্য বা প্রতিশোধ, নিরপরাধ মানুষের ওপর হামলা, সমাজে ভয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কার্যক্রম, আইন এবং শৃঙ্খলা উপেক্ষা। এটি সত্যিকারের জিহাদের বিপরীত। জিহাদ মানে ন্যায়, সীমাবদ্ধতা এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষা। ইসলামের ভাষায় সীমারেখা অতিক্রম করা ও নিরপরাধ হত্যা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

অর্থ: "তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"[১]

জঙ্গিদের 'আক্বীদাহ্: জঙ্গিদের 'আক্বীদাহ্ হলো– উগ্র, স্বার্থপর ও অত্যাচারমূলক বিশ্বাস, যা ইসলামের সত্যিকারের নীতি থেকে বিচ্যুত। যেটা খারিজী 'আক্বীদাহ্ নামে পরিচিত। তাদের মূল 'আক্বীদাহ্ হলো– "যে ব্যক্তি বড় পাপ করে, সে কুফ্‌রী অবস্থায় চলে যায় এবং তার জীবন ও প্রাণ সংহার মুসলিমদের জন্য বৈধ।" এজন্য তারা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করেছিল। খারিজী 'আক্বীদার আরো বৈশিষ্ট হলো– উগ্র ও সীমাহীন কঠোরতার মিশ্রণ। তারা ইসলামের নৈতিক বিধি উপেক্ষা করে, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা ও সমাজে ভয় সৃষ্টি করে। এর বিপরীতে সত্যিকারের জিহাদী চেতনা হলো নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ন্যায়, সীমাবদ্ধতা ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ। খারিজীদের পথ গ্রহণ করা মানে ইতিহাসের শিক্ষার প্রতি অমান্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا﴾

অর্থ: "তোমরা সেই আত্মাকে হত্যা করবে না যাকে আল্লাহ স্বয়ং নিষিদ্ধ করেছেন, যদি না সত্যিকারের কারণ থাকে এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমরা তার অভিভাবকের জন্য ক্ষমতা দিয়েছি। হত্যায় সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয়ই সে সাহায্যপ্রাপ্ত।"[২]

জঙ্গিরা সীমা অমান্য করে, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে। কুরআন স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে নিরপরাধকে হত্যা করতে এবং সীমালঙ্ঘন করতে। তারা নিজেরাও আত্মঘাতী হামলায় শামিল হয়। বিনা কারণে কোনো অমুসলিমদের হত্যা করে, যা জায়িয নেই। অথচ আজকের তরুণ সমাজ এই দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাদেরকে শিখানো হচ্ছে– বোমা বিস্ফোরণ ঘটাও, আত্মহত্যা করো, জান্নাতে চলে যাবা। কতটা হাস্যকর বিষয়কে তারা দ্বীন মনে করছে। যেখানে কুরআন ও হাদীস স্পষ্ট, সেখানে শরিয়তের সমান্য জ্ঞান নিয়ে জিহাদের পথে নেমে গেছে। বোকামি ছাড়া আর কিছু না এগুলো। এই চক্রান্ত মূলত ইহুদি-খ্রিষ্টানদের। তারা মুসলমানদের মাঝে এমন চিন্তা দ্বারার বীজ বপন করেছে। বিশ্ববাসীর কাছে মুসলমানদের ইসলামি সঠিক মহান 'ইবাদত জিহাদকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসে রূপ দিয়েছে।

জঙ্গিদের কার্যক্রম: জঙ্গিদের কার্যক্রম মানে উগ্রতা, স্বার্থ, সীমাহীন সহিংসতা এবং সামাজিক বিভ্রান্তি। তারা ইসলামের ন্যায় ও মানবিক সীমা উপেক্ষা করে, সমাজে ভয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সত্যিকারের জিহাদী চেতনা মানে আত্মসংযম, ন্যায়, সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ, যা জঙ্গিদের কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের বক্তব্য হলো– সীমাহীন হত্যাকাণ্ড চালাও। অথচ আল্লাহ এই বিষয়ে বলেছেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

অর্থ: "যে আত্মাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না যদি না সত্যিকারের কারণ থাকে।"[৩]

জঙ্গিরা সীমা অমান্য করে, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে। তারা নিরপরাধদেরও রক্ষা করে না। যদি সেখানে খারাপ ও অশ্লীল সিনেমা হয় সেখানে হত্যা কার্য চালানো যাবে না। কারণ সেখানে নিরহ মানুষ, নারী ও শিশু রয়েছে। এগুলো দা'ওয়াতের মাধ্যমে সংস্কার করতে হবে। হামলার মাধ্যমে নয়। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস,

---

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯০।*

[২] *সূরা আল-ইসরা: ৩৩।*

[৩] *সূরা আল-ইসরা: ৩৩।*

لَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا فَانِيًا.

অর্থ: "কোনো শিশু, নারী বা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।"[১]

জঙ্গিরা এই সীমা উপেক্ষা করে, যা সরাসরি ইসলামের নীতি বিরোধী এবং এতে সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾

অর্থ: "পৃথিবীতে ফাসাদ বা অস্থিরতা সৃষ্টি করো না।"[২]

সামাজিক বিভাজন ও ভয় সৃষ্টি জঙ্গিদের প্রধান কার্যক্রম, যা হারাম।

আধুনিক যুগে জঙ্গি তৎপরতা: আজকের বিশ্বে জঙ্গি তৎপরতা শুধু একটি দেশের সমস্যা নয়; এটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সামাজিক অস্থিরতার মূল উৎস। জঙ্গিরা ইসলামের প্রকৃত নীতি উপেক্ষা করে, স্বার্থ, রাজনৈতিক প্রভাব ও উগ্রতার জন্য সহিংসতা চালায়। এই প্রবন্ধে আমরা দেখব বাংলাদেশ ও বিশ্বে তাদের কার্যক্রম, প্রভাব এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভুল দিক।

বাংলাদেশে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টে ৬৩ জেলায় এক যোগে সিরিজ বোমা হামলা। ২০০১ সালের রমনা বটমূল বিস্ফোরণ, ১০ নিহত, ৫০ আহত। ২০০৩ সালে টাঙ্গাইলে মেলায় বোমা বিস্ফোরণ, ৭ নিহত, ২০ আহত। ২০১৭ সালে ঢাকা র‍্যাব ক্যাম্পে আত্মঘাতী হামলা। বিশ্ব মহলে ২০১৭, ম্যানচেস্টার: ২৩ নিহত, ১,০০০ + আহত। ২০২৩, পাকিস্তান, মাস্তুঙ: ৬০ নিহত, ৫০-৭০ আহত। ২০২৩, আফগানিস্তান, কাবুল বিমানবন্দর: ২০ নিহত, ৩০ আহত। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়া যা আধুনিক জঙ্গিবাদের ভয়াবহ দৃষ্টান্তস্বরূপ। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার জঙ্গি হামলায় ধ্বংস হয়। যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে ভবনে আঘাত করা হয় –যা আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে চিহ্নিত। এই হামলায় প্রায় তিন হাজার নিরপরাধ মানুষ নিহত হন। ঘটনাটি শুধু একটি শহর বা দেশের ক্ষতি ছিল না; এটি বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা, রাজনীতি ও ধর্মীয় সম্পর্কের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

জঙ্গিবাদের প্রকৃত চেহারা টুইন টাওয়ার ধ্বংস দেখিয়ে দেয়, জঙ্গিবাদ কিভাবে নিরপরাধ মানুষের জীবনকে তুচ্ছ করে, ধর্মের নামে সীমাহীন সহিংসতাকে বৈধ দেখাতে চায়, বিশ্বজুড়ে ভয়, ঘৃণা ও বিভাজন ছড়ায়। বিশ্বব্যাপী এর খারাপ প্রভাব পরে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর হয়। মুসলিম সমাজ ভুলভাবে সন্দেহ ও চাপের মুখে পড়ে।

"সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ" নামে বহু দেশে সংঘাত বাড়ে। অর্থাৎ- জঙ্গিদের একটি কর্মকাণ্ডের মূল্য দিতে হয়েছে পুরো মানবজাতিকে। বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে।

মুসলিম উম্মাহর করণীয়: জঙ্গিবাদ মূলত ভুল 'আক্বীদাহ্, বিকৃত ব্যাখ্যা, আবেগনির্ভর সিদ্ধান্ত ও সামাজিক বঞ্চনা এই চারটির সমন্বিত ফল। তাই সংশোধনের পথও হতে হবে হিকমাহ, 'ইল্ম, রহমত ও ন্যায়বোধভিত্তিক। সহীহ 'আক্বীদাহ্ ও জ্ঞানের সংশোধন। কুরআন-সুন্নাহর সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরা। খারিজি মানসিকতার ইতিহাস ও ভ্রান্তি স্পষ্ট করা, জিহাদ, তাকফির, হুকুম, আমির এসব বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মূলনীতি শেখানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

অর্থ: "তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে আলোচনাও করো সেরা পদ্ধতিতে।"[৩]

জিহাদী চেতনা ইসলামের বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্, নৈতিকতা ও ন্যায়ভিত্তিক সংগ্রামের নাম; আর জঙ্গি তৎপরতা সেই চেতনাকে বিকৃত করে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলায় রূপ দেয়। কুরআন-সুন্নাহর সীমার ভেতরে থেকে সত্য প্রতিষ্ঠাই জিহাদ, সীমা অতিক্রম করলেই তা জিহাদ থাকে না। নিরীহ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষা ইসলামের মৌলিক দাবি, যে তৎপরতা তা লঙ্ঘন করে, তা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। অতএব, সহীহ 'ইল্ম, হিকমাহপূর্ণ দা'ওয়াত ও দায়িত্বশীল সমাজসংস্কারই হলো আজকের বাস্তবতায় প্রকৃত জিহাদী চেতনার সঠিক প্রকাশ।

[১] *সহীহ মুসলিম- ১৭৩১।*

[২] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩৩।*

[৩] *সূরা আন্-নাহ্ল: ১২৫।*

البيئة - الطبيعة / পরিবেশ-প্রকৃতি

জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সংঘটিত সংকট ও অদৃশ্য পরিণতি

নিকোলাস বিশ্বাস*

জলবায়ু পরিবর্তনের কথা উঠলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু পরিচিত দৃশ্য– ভয়াবহ দাবানল, আকস্মিক বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ কিংবা খরায় ফেটে যাওয়া মাটি। সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং টেলিভিশনের পর্দায় এসব দৃশ্যই সবচেয়ে বেশি স্থান পায়। কারণ এগুলো তাৎক্ষণিক, দৃশ্যমান এবং উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

কিন্তু বাস্তবতা হলো– এগুলো জলবায়ু সংকটের কেবল দৃশ্যমান অংশ। যেমনি হিমশৈলের (Iceberg) সবচেয়ে বড় এবং গভীর অংশ লুকিয়ে থাকে পানির নিচে তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর প্রভাব ও ক্ষত মিশে থাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝে যা উপর থেকে দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত ক্ষতি শুধু ঘরবাড়ি ধ্বংস বা ফসলহানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ও বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলে। এই সংকটকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের দৃশ্যমান দুর্যোগের বাইরে গিয়ে এর অন্তর্নিহিত কারণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবগুলো বুঝতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

দৃশ্যমান দুর্যোগ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকাশ্য রূপ

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা ক্রমাগত বাড়ছে। অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা, তীব্র তাপপ্রবাহ, শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এবং দাবানল পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে বিপর্যস্ত করছে। এসব দুর্যোগ তাৎক্ষণিক প্রাণহানি, অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই গণমাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হয়। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে সরকার ও মানবিক সংস্থাগুলো ত্রাণ ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ থাকে তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেই, অথচ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলো অনেক বেশি গভীর এবং জটিল যা আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।

দুর্যোগের আড়ালে শুরু হয় আরেকটি সংকট

প্রতিটি জলবায়ুজনিত দুর্যোগ একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে। যখন খরায় ফসল নষ্ট হয়, তখন শুধু কৃষকের উৎপাদনই কমে না; খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়, বাজারে খাদ্যের দাম বেড়ে যায় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরো বেশি খাদ্য অনিরাপত্তার মুখোমুখি হয়। কৃষক তার আয়ের উৎস হারায়, পরিবারগুলো ঋণের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয় এবং অনেক মানুষ মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

একইভাবে নদী, খাল ও জলাধার শুকিয়ে গেলে শুধু পানির সংকটই সৃষ্টি হয় না; কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের নিরাপদ পানির জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়, যা তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগকেও সীমিত করে।

খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুতর কিন্তু কম আলোচিত প্রভাবগুলোর একটি হলো খাদ্য নিরাপত্তা। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মাটির উর্বরতা হ্রাস, বন্যা ও খরার কারণে কৃষি উৎপাদন দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুদ্র কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

ফসলের উৎপাদন কমে গেলে খাদ্যের দাম বেড়ে যায়। দরিদ্র পরিবারগুলো বাধ্য হয়ে কম এবং নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ করে। এর ফলে অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের মধ্যে। ক্ষুধা তখন শুধু একটি মানবিক সংকট নয়; এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জলবায়ু-সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

জনস্বাস্থ্যের জন্য এক নীরব হুমকি

জলবায়ু পরিবর্তন এখন জনস্বাস্থ্যের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের কারণে হিট স্ট্রোক, পানিশূন্যতা এবং তাপজনিত অসুস্থতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যার কারণে নিরাপদ পানির উৎস দূষিত হয়ে কলেরা, ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। অন্যদিকে তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে মশাবাহিত রোগ যেমন ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার বিস্তার নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অনেক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে জরুরি চিকিৎসা প্রদান ব্যাহত হয়। তাই জলবায়ু

* *লেখক, একজন মিডিয়া ফ্রীল্যান্সার।*

পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে স্বাস্থ্যখাতকে আরো শক্তিশালী ও সহনশীল করে গড়ে তোলা জরুরি।

অর্থনৈতিক ক্ষতি ও বৈষম্যের বিস্তার

জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশ নয়, অর্থনীতিকেও গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রতিটি দুর্যোগের পর সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয় উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্গঠনের জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিস্থিতি আরো কঠিন। তারা সঞ্চয় হারায়, ঋণগ্রস্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে সন্তানদের বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্যের চক্রে আটকে পড়ে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যেসব জনগোষ্ঠীর দায় সবচেয়ে কম, তারাই এর সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী।

বাস্তুচ্যুতি, অভিবাসন ও সামাজিক অস্থিরতা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ তাদের বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, উপকূলীয় লবণাক্ততা, বন্যা ও দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে বহু এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। ফলে জলবায়ুজনিত অভিবাসন দিন দিন বাড়ছে। অন্যদিকে সীমিত ভূমি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক অঞ্চলে সামাজিক উত্তেজনা, সংঘাত এবং নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন কেবল পরিবেশগত নয়, সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও বড় হুমকি হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের কারণে প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ নতুন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে। ভবিষ্যতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ এবং বৈশ্বিক অভিযোজনমূলক পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু বা পরিবেশগত অভিবাসীর সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১০০ কোটিরও বেশি হতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কোটি কোটি মানুষ অভ্যন্তরীণ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হতে পারে। এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই প্রায় ২ কোটি মানুষ অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অভিবাসীতে পরিণত হতে পারে। Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)-এর তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে (২০১৪-২০২৩) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ২১ কোটি ৮০ লাখ মানুষের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটিয়েছে যা বিভিন্ন দেশে অমানবিক বিপর্যয় ডেকে আনছে।

জলবায়ু সংকট: উন্নয়নেরও বড় চ্যালেঞ্জ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিক্ষা ব্যাহত হয়। স্বাস্থ্যসেবা দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থের একটি বড় অংশ পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে ব্যয় করতে হয়। ফলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন অনেক দেশের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এজন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই জরুরি।

দুর্যোগের আগে বিনিয়োগই সর্বোত্তম সমাধান

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা শুধু দুর্যোগের পর ত্রাণ বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রয়োজন জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি, নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, বন ও প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ এবং কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা। একই সঙ্গে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যা দুর্যোগ ঘটার আগেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেবে এবং তাদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

দৃশ্যমান ক্ষতির বাইরে তাকানোর সময় এখনই

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি অনেক সময় চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটিই মানুষের জীবন, জীবিকা, অর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই শুধু বন্যা, খরা কিংবা দাবানলের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করলেই চলবে না। আমাদের দেখতে হবে খাদ্য সংকট, স্বাস্থ্যঝুঁকি, দারিদ্র্য, বৈষম্য, বাস্তুচ্যুতি এবং উন্নয়নের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। এই সামগ্রিক চিত্রটি উপলব্ধি করলেই আমরা এমন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারব, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সহনশীল, নিরাপদ এবং টেকসই পৃথিবী গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

উপসংহার: সংকটের আড়ালে গভীর সংকট

জলবায়ু পরিবর্তন কেবল একটি পরিবেশগত সংকট নয়; এটি মানবসভ্যতার অস্তিত্ব, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য এক বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। অতএব, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় আমাদের শুধু দৃশ্যমান দুর্যোগ নয়; বরং এর অন্তর্নিহিত ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলোর প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ প্রকৃত সমাধান তখনই সম্ভব, যখন আমরা কেবল লক্ষণ নয়, সংকটের মূল কারণ এবং এর বহুমাত্রিক প্রভাব মোকাবিলায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করব। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সহনশীল এবং টেকসই পৃথিবী নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

قصيدة / কবিতা

সংগ্রামী মুসলিম

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন★

বল-তাকবীর
বল আল্লাহ আকবার,
আমি বিশ্বাসী প্রতীক রাঙানো দৃঢ়তা
আমি ঈমানী জাগরণের তীব্রতা
আমি জ্ঞানের জগতের করি না হীনমন্যতা,
আমি দা'ওয়াতী পথে উড্ডয়ন শির
সংগ্রামের রণাঙ্গনে হই রক্তাক্ত বীর।

আমি খালিদের হাতের তরবারি
আমি 'উমারের শাসনের বাতি
আমি মুস'আবের তুলানো ঝাণ্ডা
ন্যায়-ইনসাফের কাণ্ডারি।
আমি বেলালের আযানের কণ্ঠ ধ্বনি
বিশ্ব সাড়া জাগরণের সত্যের বাণী,
আমি ইয়াসিরের পরিবারের সাহিসীকতা
আমি মানি নির্যাতনের নির্মমতা।

আমি বদরের প্রান্তরের সাহিসীকতা
আমি উহুদের যুদ্ধের বীরত্বতা,
আমি খন্দকের পরিখা খনন
আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির অঙ্গীকার
বাই'য়াতের রিদ'আনের মতো সাহসীর ভার,
আমি খায়বারের দূর্গ জয়
মানি না কোনো পরাজয়,
আমি মুতার যুদ্ধের বিজয়ী বীর
খালিদ ইবনু ওয়ালিদের মতো,
আমি মক্কা বিজয়ের করি প্রেরণা
বিনা রক্তপাতে জয়ের ভাবনা,
আমি হুনায়েনে ওঠে চলা বীর
মানি না কোনো বিক্ষিপ্ত তীর,
আমি তাবূক যুদ্ধের দানবীরদের চেতনা
দানশীলতায় মোর ভাবনা,
আমি বিদায় হজ্জের ভাষণের ধ্বনি
করি উম্মাহর জাগরণের প্রতিধ্বনি,
আমি রাসূলের জীবনের আদর্শ গড়া সৈনিক
বিশ্বজাহানে তিনিই আদর্শের প্রতীক।

আমি বিপ্লবীদের জয়ধ্বনি সুর
করে ফেলি বাতিলকে ভাংচুর,
আমি তাওহীদের বাণী প্রচারে
আঘাত হানি শির্কের মসনদে,
আমি কুরআন ও হাদীস দিয়ে করি সংস্কার
দূর হবে সব ভ্রান্তি-কুসংস্কার,
আমি সত্য দ্বীনের পতাকা ওঠানো বীর
অবিরাম গতিশীলতায়ও আমি স্থির,
আমি ভাঙবো তাগুতের গড়া প্রসাদ
বাতিলের গড়া মসনদ,
আমি শৃঙ্খলবোধ্য গড়ে ওঠা হাতিয়ার
মানি না কোনো দূরবদ্ধের কারাগার,
আমার সত্যমুখী পিপাসার্ত হৃদয়
সত্যের জন্য করি জীবন বিনিময়।

যেখানে ইসলামের চলে অপসংস্কৃতি
সেখানে থাকতে আমি জানাই অস্বীকৃতি,
যেখানে ইসলাম ধর্মকে করা হয়েছে বিকৃতি
সেখানে আমি ফিরেয়ে আনি তাঁর আকৃতি,
যেখানে হালাল-হারাম না বুঝে চলছে পুঁজিবাদীর সন্ধান
সেখানে করবো আমি হালালের উত্থান,
যেখানে জিহাদের নামে গড়ে ওঠে জঙ্গি
সেখানে গড়বো আমি সঠিক দা'ওয়াত ও জিহাদী সঙ্গী,
যেখানে সভ্যতার নামে গড়ে ওঠে জাহিলিয়াতে নমস্কার
সেখান থেকে দূর করবো আমি সকল বেড়াজাল-কুসংস্কার,
যেখানে হেদায়েতের নামে চলে ভ্রান্তির ডাক
সেখানে করবো আমি ভ্রষ্টাকে পাক।

আমি ইবনু ক্বাসিমের সিন্ধু জয়য়ের পতাকা
মানি না কোনো অন্যায়ের বক্রতা,
আমি ইবনু জাহিদের আন্দালুস বিজয়
আবারো হারানো ইতিহাস করবো জয়,
আমি মুহাম্মদ আল-ফাতেহ এর মতো দূর্গ জয়ী বীর
জেগে উঠা সাহসী মম শীর,
আমি আইয়ুবীর বাইতুল মাকদিসে উড়ানো পতাকা
আবারো বাইতুল মাকসিদ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা

আমি ইব্রাহিমী একাত্মবাদের শিরোমণি
মুহাম্মদী দ্বীন প্রচারের নিকুণ্ঠ বাণী,
আমি আবারো জ্বালাব ইসলামি চেতনার আলো
দূর হবে সব জাহিলিয়াতের ঘন কালো,
আমি জাহিলিয়াতের প্রাসাদকে করবো খনন
প্রতিষ্ঠা করব ইসলামি কানন,
আমি বিশ্ব কাঁপানো ন্যায়ের সৈনিক
প্রতিষ্ঠা করবো ইনসাফের প্রতীক,
আমি তাওহীদী কালিমার উড্ডায়ন ধ্বনি
পাশ্চাত্য মতবাদ দূর করা কুরআনের বাণী,
আমি গড়ে উঠাবো তাওহিদী শক্তি
দূর হবে সব তাগুতের মূর্তি,
তাওহীদের আলোয় গড়বো বিশ্বধরা
পতন হবে সব সেকুলারের ধারা,
বলো তাওহীদীবাদ, বলো জিন্দাবাদ।

★মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে চার উপজেলা জমঈয়তের কাউন্সিল সম্পন্ন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর এবং রাজশাহী জেলার পবা, তানোর ও গোদাগাড়ী উপজেলা জমঈয়তের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল ও সুধী সমাবেশ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পৃথক চারটি কাউন্সিলে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের পাশাপাশি কার্যনির্বাহী পরিষদ, জেনারেল কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ ঘোষণা করা হয়।

গোমস্তাপুর উপজেলা কাউন্সিল: গত ২২ আগস্ট ২০২৬, শনিবার সকাল ১০টায় গোমস্তাপুর উপজেলার মাদরাসাতু বায়তিল হিকমাহ আল-মুআসিরাহতে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যক্ষ মুহা. আনসারুজ্জামান কাউন্সিল উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। অধ্যক্ষ মাওলানা মুহা. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এবিএম আখতারুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ও জনতা অংশগ্রহণ করেন।

কাউন্সিলে ডা. আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি এবং এবিএম আখতারুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ, ৬১ সদস্যবিশিষ্ট জেনারেল কমিটি ও ১৩ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ঘোষণা করা হয়।

পবা উপজেলা কাউন্সিল ও সুধী সমাবেশ: একই দিন বিকেল ৩টায় নওহাটা মডেল মসজিদ হলরুমে পবা উপজেলা জমঈয়তের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। গেস্ট অব অনার ছিলেন নওহাটা পৌরসভার সাবেক মেয়র আলহাজ মো. মকবুল হোসেন এবং প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

হাফেজ মাওলানা মো. আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে ও ড. আহমাদুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে ড. আহমাদুল্লাহকে সভাপতি এবং হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এ সময় ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ, ৬১ সদস্যবিশিষ্ট জেনারেল কমিটি ও ১৩ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ঘোষণা করা হয়।

তানোর উপজেলা কাউন্সিল: গত ২৮ আগস্ট ২০২৬, শুক্রবার বিকেল ৩টায় আব্দুল্লাহ কমিউনিটি সেন্টারে তানোর উপজেলা শাখার ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ এবং প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা মো. আসলাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও হাফেয মো. আজিমুদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

কাউন্সিলে মাওলানা আব্দুল হামীদকে সভাপতি এবং মো. মোকসেদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ, ৬১ সদস্যবিশিষ্ট জেনারেল কমিটি ও ১৩ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ঘোষণা করা হয়।

গোদাগাড়ী উপজেলা কাউন্সিল ও সুধী সমাবেশ: গত ২৯ আগস্ট ২০২৬, শনিবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে গোদাগাড়ী উপজেলার মডেল মসজিদে ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পাদক প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা মো. আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে ও শায়খ মো. আব্দুল মুমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে মাওলানা আব্দুল্লাহকে সভাপতি এবং মাওলানা আব্দুল বারিকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পাশাপাশি ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ, ৬১ সদস্যবিশিষ্ট জেনারেল কমিটি ও ১৩ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ঘোষণা করা হয়।

চারটি কাউন্সিলেই বক্তারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণ এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াতি ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তাঁরা বলেন, সকল বিভেদ ও মতবাদী সংকীর্ণতা পরিহার করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারলেই মুসলিম উম্মাহ তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। একই সঙ্গে তৃণমূল থেকে সর্বস্তরে দাওয়াতি কার্যক্রম জোরদার এবং সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ৪র্থ মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ আগষ্ট রোজ শনিবার বাদ 'আসর নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ৪র্থ মাসিক আলোচনা সভা

অনুষ্ঠিত হয় দেবই কাজিরবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। এতে সভাপতিত্ব করেন শাইখ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম রাজ, সভাপতি, দেবই কাজিরবাগ এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। এতে আলোচনা পেশ করেন শাইখ ইকবাল হাসান সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আবুল হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন, নারী শিশু বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ হাফেজ জুলফিকার আলী, দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আলিমুল্লাহ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ খলিলুল্লাহ মোল্লা, সদস্য, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মোহাম্মদ ইউসুফ, সদস্য, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ মাহমুদুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক, দেবই কাজিরবাগ এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। উপস্থাপনায় মুহাম্মদ রমাযান মিয়া সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান ও দাঈ', নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।

পাঁচরুখী ইসলাম পাড়া জামে মসজিদ মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ আগষ্ট শনিবার বাদ মাগরীব হতে নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস এর অন্তর্গত পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস এর পাঁচরুখী ইসলাম পাড়া জামে মসজিদে মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে আলোচনা পেশ করেন শাইখ আমিনুল ইসলাম মাদানী, ভাইসপ্রিন্সিপাল, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ।

পাঁচরুখী ফিরোজ মৌলভী বাড়ী জামে মসজিদ শাখা জমঈয়ত-এর মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ আগষ্ট শনিবার বাদ মাগরীব হতে নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস এর অন্তর্গত পাঁচরুখী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস এর পাঁচরুখী ফিরোজ মৌলভী বাড়ী জামে মসজিদে মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে আলোচনা পেশ করেন শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মো. মাসউদুর রহমান, দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক নরসিংদী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।

নারায়ণগঞ্জের 'মিয়া সাহেব' অধ্যাপক ফজলুল বারী খান আর নেই

আরাফাত ডেস্কঃ নারায়ণগঞ্জের দ্বীনি, সামাজিক ও সাংগঠনিক অঙ্গনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'মিয়া সাহেব' অধ্যাপক শাইখ ফজলুল বারী খান আর নেই। দীর্ঘদিন ব্রেন টিউমারে ভোগার পর গত ২৩ আগস্ট দিবাগত রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

তাঁর গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ঐতিহ্যবাহী নোয়াগাঁও গ্রামে। তাঁর ইন্তেকালে নারায়ণগঞ্জসহ দেশের আহলে হাদীস অঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক, দ্বীনি ব্যক্তিত্ব, শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষী।

অধ্যাপক ফজলুল বারী খান ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক ও দ্বীনি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আব্দুল মোহাইমেন খানের তৃতীয় পুত্র। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পিতার ইন্তেকালের পর পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় তিনি নারায়ণগঞ্জের ৭০ গ্রামের 'মিয়া সাহেব' হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়েও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর নারায়ণগঞ্জের ৭০ গ্রামের 'মিয়া সাহেব' হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর একমাত্র পুত্র, ২০ বছর বয়সী সাদাদ বারী খান। তিনি পিতার জানাযার সালাতে ইমামতি করেন। জানাযা শেষে নোয়াগাঁও মসজিদের পার্শ্ববর্তী পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

নোয়াগাঁও মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জানাযায় প্রায় লক্ষাধিক মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন। এতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ ফকীর বদরুজ্জামান, প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী ও শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম এবং যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসীন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম উমরী, প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারি মুহা. জাকির হোসেন খান, জনসংযোগ ও মিডিয়াবিষয়ক সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদীসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম আজাদ, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি, আলেম-ওলামা, জমঈয়ত ও শুব্বানে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক সাধারণ মুসল্লী।

মৃত্যুকালে অধ্যাপক শাইখ ফজলুল বারী খান তাঁর মাতা, স্ত্রী, এক কন্যা, এক পুত্র এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহর কাছে দু'আ কামনা করেন।

দ্বীনি দাওয়াহ, শিক্ষা, সমাজসেবা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অধ্যাপক ফজলুল বারী খানের দীর্ঘদিনের অবদান নারায়ণগঞ্জের মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আল্লাহ মাইয়্যিতের সকল নেক 'আমল কবুল করুন, তাঁর ভুলত্রুটি ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর প্রতি সবরে জামীল দান করুন –আমিন।

أخبار الشبان / শুব্বান সংবাদ

কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ১৯ আগস্ট ২০২৬, বুধবার, জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রহ.) মিলনায়তনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের উদ্যোগে সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপপ্রাপ্ত এবং কুল্লিয়া, সানাবিয়া, মুতাওয়াসিতা ও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক মো. নাজিবুল্লাহ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা শাইখ মোফাজ্জল হোসেন মাদানী।

আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মোজাফফর বিন মহসিন এবং কবি নজরুল সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শাইখ ড. মোহাম্মাদ হেদায়েত উল্লাহ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক আল-আমিন মাদানীসহ সংগঠনের অন্যান্য দায়িত্বশীল ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপপ্রাপ্ত এবং কুল্লিয়া, সানাবিয়া, মুতাওয়াসিতা ও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী মোট ১১০ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বক্তারা কৃতি শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে জ্ঞানার্জন, নৈতিকতা ও দ্বীনি মূল্যবোধের সমন্বয়ে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দেশ, জাতি ও উম্মাহর কল্যাণে নিজেদের মেধা, জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্য ও দু'আর মাধ্যমে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কালনী নোয়াগাঁও এলাকা শুব্বান-এর কাউন্সিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ আগষ্ট বাদ মাগরী খাইলসা জামি আহ দারুল ইহসান মাদ্‌রাসা জামে মসজিদে নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান-এর অন্তর্গত কালনী নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর ১১তম কাউন্সিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন হাঃআরাফাত, অধ্যায়নরত, জামি আহ দারুল ইহসান মাদ্‌রাসা খাইলসা। সভাপতিত্ব করেন শাইখ মুহাম্মদ ইউসুফ। সঞ্চালনায় ছিলেন মুহাম্মদ রমাযান মিয়া সাধারণ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জনাব আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম, সভাপতি, রুপগঞ্জ থানা কৃষকদল। উদ্বোধক ছিলেন জনাব আলহাজ্ব আঃমতিন মিয়া, বিশিষ্ট সমাজ সেবক কালনী। কুরআন সুন্নাহ থেকে দলিল সহ আলোচনা পেশ করেন শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন, নারী শিশু বিষয়ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ আওলাদ হোসাইন, সহ সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান। শাইখ শহীদুল্লাহ মিয়া, সভাপতি, রুপগঞ্জ থানা শুব্বান। শাইখ হাফেজ জায়েদ মোল্লা, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, কান্‌চন পৌর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস। শাইখ হাফেজ ওবায়দুর সোহাগ, সা. সম্পাদক, রুপগঞ্জ থানা শুব্বান। শাইখ ইমরান হোসেন, সভাপতি, দাউদপুর ইউনিয়ন শুব্বান। শাইখ সজিব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক, দাউদপুর ইউনিয়ন শুব্বান। প্রমুখ আলোচনা পেশ করেন এবং আগামী এক বছরের জন্য শাইখ মুহাম্মাদ ইউসুফ সভাপতি ও শাইখ মুহাম্মদ আনিসুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): ***একজন নারী বিবাহের আগে অবৈধভাবে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণে পেটে বাচ্চা চলে আসে। তা না জেনে পরে অন্যত্র তার বিবাহ হয় শরীয়া আইনেই। পরে পেটে বাচ্চার কথা জানতে পেরে ঐ বাচ্চা নষ্ট করা হয়েছে। এখন কি তার বিয়ে সহীহ হয়েছে। নাকি নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।***

মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

***জবাব:* প্রথমতঃ** যদি কোনো নারীর সঙ্গে বিবাহের আকদ (বিয়ে) এমন অবস্থায় সম্পন্ন হয় যে, তিনি যিনার কারণে গর্ভবতী, তাহলে মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে এই বিবাহ সহীহ (বৈধ) নয়। অন্যদিকে হানাফী ও শাফি'য়ী মাযহাবের মতে, যিনার কারণে গর্ভবতী নারীকে বিয়ে করা বৈধ। তবে, যদি তাকে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে করে, যে তার সঙ্গে যিনা করেছিল, তাহলে তার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর জন্য তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ নয়। এর প্রমাণ রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস:

"গর্ভবতী নারীর সঙ্গে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না।" *(সুনানে আবূ দাউদ- ২১৫৭; জামে' তিরমিযী- ১৫৬৪)* শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এছাড়া রাসূল (ﷺ) হুনায়নের যুদ্ধের দিন বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্যের ক্ষেতের উপর নিজের পানি (বীর্য) সিঞ্চন করবে।" *(আবূ দাউদ- ২১৫৯, হাসান)*

অর্থাৎ- অন্যের গর্ভে ধারণ করা সন্তান থাকা অবস্থায় সেই গর্ভবতী নারীর সঙ্গে সহবাস করা বৈধ নয়। *(ফাতহুল কাদীর- ৩/২৪১; আল-মুগনী- ৭/১০৭; আল-মাওসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ- ১৯/৩৩৭)*

যদি কোনো নারী নিজেই স্বীকার করে যে, বিবাহের আকদের সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন, তাহলে সেই বিবাহের বৈধতা সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সতর্কতা ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম হলো, বর্তমানে পুনরায় বিবাহের আকদ সম্পন্ন করা। পদ্ধতি হলো– নারীর অভিভাবক (ওলী) অথবা তার প্রতিনিধি (ওকীল), দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে, স্বামীর সঙ্গে পুনরায় আকদ সম্পন্ন করবেন। তখন ওলী বলবেন: "আমি আমার কন্যা অমুককে আপনার সঙ্গে বিবাহ দিলাম।" আর স্বামী বলবেন: "আমি আপনার কন্যা অমুককে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম।" এভাবে পুনরায় আকদ সম্পন্ন করলে মতভেদের বিষয়টি থেকে বেরিয়ে আসা যায় এবং বিবাহের বৈধতা সম্পর্কে অধিক নিশ্চয়তা অর্জিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ গর্ভপাত করানো একটি গুরুতর অন্যায় ও মহাপাপ। তাই উচিত দ্রুত আল্লাহ তা'আলার কাছে আন্তরিক তাওবাহ্ করা, এই জঘন্য কাজের জন্য গভীর অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

আর এই গর্ভপাতের ফলে শরীয়তের যেসব বিধান (যেমন- গুনাহ, দায়বদ্ধতা, কাফফারা বা দিয়াত ইত্যাদি) প্রযোজ্য হবে, তা গর্ভপাতের সময় ভ্রূণের বয়স কত ছিল, তার ওপর নির্ভর করে।

প্রথম অবস্থা: যদি ভ্রূণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তাতে মানুষের আকৃতি (হাত-পা, মাথা ইত্যাদি) স্পষ্টভাবে গঠিত হয়েছে, তাহলে দেখতে হবে যে, তার বয়স চার মাস (১২০ দিন) অতিক্রম করেছে কি না।

যদি চার মাস অতিক্রম করে থাকে, তাহলে সে একজন পূর্ণ মানবসত্তা হিসেবে গণ্য হবে। *(বুখারী- ৩২০৮)* এ অবস্থায় দিয়াত (রক্তপণ) এবং কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।

দিয়াতের পরিমাণ: এ ক্ষেত্রে দিয়াত হলো 'গুররাহ (غُرَّة)', অর্থাৎ- একজন দাস বা একজন দাসী প্রদান করা।

যদি দাস বা দাসী পাওয়া না যায় (বর্তমান যুগে যেমন নেই), তাহলে এর পরিবর্তে পাঁচটি উটের সমমূল্যের অর্থ দিতে হবে। কারণ, ভ্রূণের দিয়াত তার মায়ের পূর্ণ দিয়াতের এক-দশমাংশ। আর জানা আছে যে, একজন স্বাধীন মুসলিম নারীর পূর্ণ দিয়াত পঞ্চাশটি উট। সুতরাং, ভ্রূণের দিয়াত হবে পাঁচটি উট বা ৫টা উটের সমপরিমাণ অর্থ। *(আল-মাওসুআহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ- ২/৫৯)*

এটা আদায় করবে যারা হত্যার কাজে অংশগ্রহণ করেছে তারা সবাই মিলে। এ বিধান তখনই প্রযোজ্য, যখন ভ্রূণ মৃত অবস্থায় গর্ভ থেকে বের হয়।

কিন্তু যদি ভ্রূণ জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, এরপর মারা যায়, তাহলে তার জন্য পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে; অর্থাৎ- একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিয়াতের সমপরিমাণ দিয়াত প্রদান করতে হবে। *(শারহু মুসলিম- ১১/১৭৬)*

এই দিয়াত (রক্তপণ) মৃত শিশুর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শরীয়তের উত্তরাধিকার বিধান অনুযায়ী বণ্টন করা হবে।

তবে যে ব্যক্তি গর্ভপাত বা হত্যার জন্য দায়ী, সে এই দিয়াতের উত্তরাধিকারী হবে না, কারণ হত্যাকারী তার ভুক্তভোগীর উত্তরাধিকার পায় না। *(আত-তামহীদ- ২৩/৪৪৩)*

কাফফারা হচ্ছে– দাস মুক্ত করা সম্ভব না হলে টানা দুই মাস সিয়াম রাখা। *(সূরা আন্-নিসা: ৯২)*

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি ভ্রূণের মানবাকৃতি (হাত-পা, মাথা ইত্যাদি) স্পষ্টভাবে গঠিত হয়ে যায়, কিন্তু চার মাস (১২০ দিন) পূর্ণ না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে শুধু দিয়াত (গুররাহ) ওয়াজিব হবে; কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে তখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে তাকে পূর্ণ মানবসত্তা (নফস) হিসেবে গণ্য করা হবে।

দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার এ মতটি অধিকাংশ (জুমহুর) আলেমের মত। এমনকি ইমাম নববী এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ***(শারহু মুসলিম- ১১/১৭৬)***

দিয়াত হলো– 'গুররাহ (غُرَّة)', অর্থাৎ- একজন দাস বা একজন দাসী প্রদান করা। যদি দাস বা দাসী পাওয়া না যায় (বর্তমান যুগে যেমন নেই), তাহলে এর পরিবর্তে পাঁচটি উট বা ৫টা উটের সমমূল্যের অর্থ দিতে হবে।

তৃতীয় অবস্থা: যদি ভ্রূণকে মানুষের আকৃতি (হাত-পা, মাথা ইত্যাদি) গঠিত হওয়ার আগেই গর্ভপাত করা হয়, তাহলে তোমাদের ওপর কোনো দিয়াত (রক্তপণ) বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে, এ কাজের জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে আন্তরিক তাওবাহ্ করতে হবে এবং অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (০২): ***সালাতে একাধিক ছানা পাঠ করা আবার রুকূ'র ও সাজদার এবং অন্যান্য স্থানে বর্ণিত সকল দু'আ কি একসাথে পড়া যাবে। যেমন- সাজদার একাধিক দু'আ একসাথে পড়া যাবে কি?*** *সাজ্জাদ, ডেমরা, ঢাকা।*

জবাব: সালাতের প্রতিটি স্থানে যে সকল যিক্র ও দু'আ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো একত্রে পাঠ করা মুস্তাহাব (উত্তম)। এর মধ্যে রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পরের যিক্রসমূহও অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যদি এমন প্রমাণ থাকে যে সবগুলো একত্রে পড়া মুস্তাহাব নয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে সেই প্রমাণ অনুযায়ী 'আমল করা হবে। যেমন ছানার ক্ষেত্রে। এ কারণেই একদল আলেম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানোর পর বর্ণিত সব যিক্র একত্রে পড়া মুস্তাহাব, যতক্ষণ না এতে অন্যের কষ্ট হয়। যেমন- কেউ যদি ইমাম হন এবং মুক্তাদিরা তাঁর দীর্ঘ সময় নেওয়াকে পছন্দ না করেন, তাহলে দীর্ঘ করা উচিত নয়। আর যদি সবগুলো একত্রে পাঠ না করা হয়, তবে কখনো একটি, কখনো আরেকটি এভাবে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন যিকির পড়া উচিত, যাতে সহীহ সুন্নাহর কোনো যিকিরই পরিত্যক্ত বা ছুটে না যায়।

ইমাম নববী তাঁর "আল-আযকার" (পৃ. ৫৪)-এ রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পরের যিক্রগুলো উল্লেখ করার পর বলেন: "জেনে রাখো, রুকূ'র যিক্র সম্পর্কে যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, তেমনি এখানেও বর্ণিত সব যিক্র একত্রে পাঠ করা মুস্তাহাব। আর জেনে রাখো, এই সব যিক্র ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারী সবার জন্যই মুস্তাহাব। তবে ইমাম সবগুলো যিক্র একত্রে পড়বেন না, যদি না তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে মুক্তাদিরা সালাত দীর্ঘ না হওয়াকে পছন্দ করেন।"

মুহাম্মদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন তাঁর "আশ-শারহুল মুমতি'" (৩/৭৭) এ রুকূ'র একাধিক যিক্র উল্লেখ করার পর এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন সবগুলো একত্রে পড়া হবে, নাকি একটি পড়াই যথেষ্ট?

তিনি বলেন: "এ বিষয়ে কিছুটা মতের অবকাশ রয়েছে। তবে সালাতের শুরুতে (ইস্তিফতাহ) বর্ণিত সব দু'আ একসঙ্গে পড়া হয় না; বরং কখনো একটি, কখনো অন্যটি পড়া হয়। এর দলিল:

আবূ হুরাইরাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি সালাত শুরু করার পর (তাকবীরে তাহরিমের পরে) কী দু'আ পড়েন, তখন নবী (ﷺ) উত্তরে বলেছিলেন: ...اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ এখানে তিনি سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ... দু'আটির উল্লেখ করেননি।

এ থেকেই বুঝা যায় যে, ইস্তিফতাহ (সালাতের শুরুতে পড়ার দু'আসমূহ) একসঙ্গে সবগুলো পড়া হয় না; বরং কখনো একটি, কখনো অন্যটি পড়া হয়। তাই সেগুলো একত্রে পাঠ করার বিধান নেই। কিন্তু রুকূ'র যিক্রের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের নিকট পরিচিত মত হলো, সেগুলো সবই একত্রে পড়া যাবে।"

রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পরের যিক্রগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ- যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করেন, তাহলে তাঁর জন্য সব সহীহ যিক্র একত্রে পড়া শরীয়তসম্মত।

ইমামের জন্যও সবগুলো একত্রে পড়া বৈধ, যদি এতে মুক্তাদিদের কষ্ট না হয়, অথবা তিনি জানেন যে তারা সালাত কিছুটা দীর্ঘ হওয়া বিরক্ত নয়। কিন্তু যদি সবগুলো একত্রে পড়লে মুক্তাদিদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা তারা এতে সন্তুষ্ট কি না তা জানা না থাকে, তাহলে সুন্নাহে বর্ণিত যেকোনো একটি পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থাকবেন এবং নিজের পেছনের মুসল্লিদের জন্য কষ্টের কারণ হবেন না।

শায়খ সালিহ আল-উসাইমীন (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিফাজত করুন) বলেন: শরীয়তের বিধান হলো যে স্থানে সব বর্ণিত যিক্র বা দু'আ একত্রে পড়া সম্ভব, সেখানে

সবগুলোই পড়া যাবে। আর যে স্থানে সবগুলো একত্রে পড়া সম্ভব নয়, সেখানে একটি পড়েই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত ইস্তিফতাহর (সালাতের শুরুতে পড়ার দু'আ) একাধিক ধরন রয়েছে। কিন্তু মুসল্লি সেগুলোর একটিই পড়বে। কারণ, সেই স্থান (তাকবীরের পরের সংক্ষিপ্ত নীরবতা) একাধিক দু'আ ধারণ করে না।

এর প্রমাণ হলো– আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকবীর বলার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকেন, তখন কী বলেন?' তখন নবী (ﷺ) তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, ওই নীরবতার সময়ে একটিমাত্র ইস্তিফতাহ পড়াই উদ্দেশ্য। সুতরাং এ দলিল প্রমাণ করে যে, এই স্থানে একাধিক দু'আ পড়া যাবে না। কিন্তু যে স্থান অতিরিক্ত যিক্র গ্রহণ করতে পারে, যেমন- রুকূ'র তাসবীহ বা সিজদার দু'আসমূহ, সেখানে সবগুলোই পড়া যাবে। কারণ নবী (ﷺ) বলেছেন: 'রুকূ'তে তোমরা তোমাদের রবের মহিমা বর্ণনা করো, আর সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করো; কেননা সে অবস্থায় দু'আ কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।' তাই সিজদায় বর্ণিত সব যিক্র ও দু'আই পড়া যাবে, কারণ এ স্থান তা ধারণ করতে সক্ষম। একইভাবে সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান। যেহেতু এ স্থান সব যিক্র পাঠের উপযোগী, তাই সেগুলো সবই পড়া হবে।" ***(https://www.youtube.com/watch?v=wBxv-JD1go0)*** যদিও ইমাম নববীর মতে, একাধিক সানা একত্রে পড়া বৈধ রয়েছে। *(আল-আযকার: ৪৫)*

জিজ্ঞাসা (০৩): ***যে মুসলিম রক্ত দান করে, সে কি এর জন্য সওয়াব পাবে? এবং এটি কি তার জন্য সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে?*** *ইমাম হাসান, বগুড়া।*

জবাব: কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহে নববীতে মানুষের প্রতি ইহসান করা, তাদের সাহায্য করা এবং তাদের বিপদ-কষ্ট দূর করার ফযীলত সম্পর্কে অনেক দলিল বর্ণিত হয়েছে। এসব দলিলের সাধারণ অর্থের মধ্যে রক্ত দান করাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"তোমরা সৎকর্ম করো (ইহসান করো)। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।" *(সূরা আল-বাকারাহ্: ১৯৫)*

আর প্রাণ রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যে ব্যক্তি কোনো প্রাণকে বাঁচায়, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাল।" *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২)*

ইমাম বুখারী (২৪৪২) ও মুসলিম (৬৭৪৩) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে থাকেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের একটি দুনিয়াবি বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন।"

ইমাম বুখারী (২৩৬৩) ও মুসলিম (৫৯৯৬) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

এক ব্যক্তি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত অবস্থায় একটি কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর বের হয়ে দেখল, একটি কুকুর তৃষ্ণার কারণে হাঁপাচ্ছে এবং মাটি চাটছে। লোকটি বলল, "আমি যে তৃষ্ণায় কষ্ট পেয়েছিলাম, এই কুকুরটিও তেমন কষ্ট পাচ্ছে।" অতঃপর সে তার মোজায় পানি ভরে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তার এই কাজের বিনিময়স্বরূপ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! পশু-পাখির প্রতিও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে?"

তিনি (ﷺ) বললেন: "প্রত্যেক প্রাণীর সেবায় সওয়াব রয়েছে।" ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণীর প্রতি সদাচরণ করা যেমন- তাকে পানি পান করানো ইত্যাদিতে সওয়াব রয়েছে।" অর্থাৎ- কোনো সম্মানিত/সুরক্ষিত প্রাণীকে পানি পান করানো, খাবার দেওয়া এবং তার প্রতি সদাচরণ করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

তাহলে প্রশ্ন হলো– যে ব্যক্তি একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও ক্ষমা লাভ করে, সেই ব্যক্তি যদি একজন মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে, তার সওয়াব কত বড় হতে পারে!

ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ (২৫/৭০)-এ বলা হয়েছে– যে অবস্থায় রক্তদান করা মুস্তাহাব (উত্তম ও প্রশংসনীয়), সে অবস্থায় এতে মহান সওয়াব রয়েছে। আর যে অবস্থায় রক্তদান করা ওয়াজিব হয়ে যায়, সে অবস্থায় এর সওয়াব আরো বেশি। কারণ ওয়াজিব 'আমলের সওয়াব নফল 'আমলের সওয়াবের চেয়ে বেশি।

সুতরাং এর মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, রক্তদানের মধ্যে মহান সওয়াব রয়েছে এবং এটি সাদাক্বার বিভিন্ন প্রকারের একটি।

জিজ্ঞাসা (০৪): ***এমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি, যে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং যে ইসলামের অনুসারী নয় তাকে রক্ত দিয়ে কি আমি সাহায্য করতে পারি?*** *আব্দুল্লাহ নরসিংদী।*

জবাব: কাফিরকে রক্ত দান করার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আমাদের জানা নাই। আল্লাহ বলেছেন:

“যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।” *(সূরা আল-মুমতাহিনাহ্: ৮)*

অতএব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে সকল কাফির আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা ও তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা থেকে তিনি আমাদের নিষেধ করেননি।

আর চরম সংকটাপন্ন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য অত্যন্ত কঠিন প্রয়োজনের মধ্যে থাকে।

এর একটি প্রমাণ হলো আসমা বিনতু আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র মা, যিনি তখন কাফির ছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মদিনায় তাঁর মেয়ে আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সদাচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তখন আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ফাতাওয়া জানতে চাইলেন। তিনি (ﷺ) তাঁকে মায়ের সঙ্গে সদাচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখার অনুমতি দিলেন এবং বললেন: “তোমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখো।” *(বুখারী- ২৬২০)*

ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “যদি কোনো মু‘আহাদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) অথবা মুস্তা’মিন (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম) যার সঙ্গে আমাদের কোনো যুদ্ধ নেই রক্তের প্রয়োজনে চরম সংকটে পড়ে, তাহলে তাকে রক্ত দান করে সাহায্য করতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- সে যদি এমন অবস্থায় পড়ে যে মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া তার জন্য বৈধ হয়ে যায় (জীবন বাঁচানোর জন্য), তেমনি তাকে রক্ত দান করাও বৈধ। আর এ কাজে তুমি সওয়াব পাবে। কারণ যে ব্যক্তি সাহায্যের চরম প্রয়োজনে রয়েছে, তাকে সাহায্য করতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই।” *(ফাতাওয়া নূরুন ‘আলাদ-দারব- শায়খ ‘আব্দুল আযিয বিন বায [রাহিমাহুল্লাহ], ১/২৯২-২৯৩)*

জিজ্ঞাসা (০৫): ***কোনো ব্যক্তিকে রক্ত দেওয়ার পর সে যাতায়াত, খাবার খরচসহ কিছু হাদীয়া দেয়। এটা নেওয়া বৈধ হবে কি?*** *রহমাতুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ।*

***জবাব:* প্রথম কথা–** রক্ত বিক্রি করা হারাম। কারণ আল্লাহ বলেন: “তোমাদের জন্য মৃত প্রাণী, রক্ত এবং শূকরের গোশ্‌ত হারাম করা হয়েছে...।” *(সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩)*

আর কোনো জিনিস যখন শরিয়তে হারাম করা হয়, তখন সাধারণভাবে তার ক্রয়-বিক্রয় এবং তার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করাও হারাম হয়। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

“আল্লাহ ইহুদিদের অভিশাপ করেছেন”– তিনি কথাটি তিনবার বললেন। “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ওপর চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করলো। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর কোনো জিনিস খাওয়া হারাম করেন, তখন তার মূল্যও তাদের জন্য হারাম করে দেন।” *(আবূ দাঊদ- ৩৪৮৮, সহীহ)*

ইবনু রুশদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “যে জিনিসের শরিয়তসম্মত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তা বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ নয়। যেমন- স্বাধীন মানুষ, মদ, শূকর, বানর, রক্ত, মৃত প্রাণী এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস।” *(আল-মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত- ২/৬২)*

ইমাম বুখারী (২২৩৮) আবূ জুহাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।” এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রক্তদাতাকে যে খাবার বা অর্থ প্রদান করে, তা মূলত রক্তদাতার প্রতি সহায়তা ও সদাচরণ এবং তার সম্ভাব্য ক্ষতি বা দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। অর্থাৎ- এটি রক্তদানের প্রক্রিয়ারই একটি সহায়ক ব্যবস্থা।

সুতরাং, রক্তদাতার উদ্দেশ্য যদি রক্ত বিক্রি করা না হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপকার করা হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও যদি রক্ত কিনতে না চায় এবং উভয় পক্ষের সম্পর্ক যদি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, কোনো লেনদেনের হুকুম নির্ধারণে উদ্দেশ্য ও নিয়তেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

“তবে উপহার (হিবা) বা পুরস্কার হিসেবে অর্থ প্রদান করতে কোনো অসুবিধা নেই, মানবিক ও কল্যাণমূলক এই কাজটি করতে মানুষকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে। কারণ এটি পারস্পরিক বিনিময়মূলক লেনদেন (মু‘আওয়াদাত)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি দান-অনুদান (তাবাররু‘আত)-এর অন্তর্ভুক্ত।” *(আল-মাজমা‘ আল-ফিকহি আল-ইসলামি-এর সিদ্ধান্তসমূহ- পৃ. ২৫৩-২৫৪)* তবে কেউ যদি অর্থ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই (রক্ত দিতে) যায়, সে মূলত তার রক্ত বিক্রি করেছে। আর এটি হারাম, যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত সুন্নাহ ও আলেমদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

জিজ্ঞাসা (০৬): ***একজন মহিলা একা থাকে এবং সে অসুস্থ। এমতাবস্থায় কি ইদ্দত পালনের জন্য তার ছেলের বাড়িতে যাওয়া বৈধ হবে?*** *সুমনা, বাগেরহাট।*

***জবাব:* প্রথমতঃ** মূলনীতি হলো– যে নারীর স্বামী মারা গেছে, তার জন্য ইদ্দত চলাকালীন সে যে বাড়িতে বসবাস করছিল, সেই বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে রাতযাপন করা

সূচীপত্র

জায়িয নয়। চার মাযহাবের ফিকহি মত অনুযায়ী এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। *(দেখুন: মুখতাসারুল কুদূরী- ১৭০; শরহুয যুরকানী 'আলা মুখতাসারি খলীল ও হাশিয়াতুল বানানী- ৪/৩৯৪; রওদাতুত তালিবীন- ৮/৪১৬; কাশশাফুল কিনা'- ৫/৪৩০)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফুরাই'আহ বিনতু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছিলেন: "তুমি তোমার সেই বাড়িতেই অবস্থান করো, যে বাড়িতে তোমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ তোমার কাছে পৌঁছেছিল যতক্ষণ না নির্ধারিত সময় (ইদ্দত) পূর্ণ হয়।"

তিনি বলেন: "অতঃপর আমি সেই বাড়িতেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করেছি।" *(আবূ দাউদ- ২৩০০, সহীহ)*

দ্বিতীয়তঃ যদি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী একেবারে একা হয়ে যান এবং তিনি রোগে আক্রান্ত হন, আর তাঁর দেখাশোনা ও সেবা করার মতো কেউ না থাকে এবং একা থাকা তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, যা সাধারণভাবে অন্যান্য ইদ্দত পালনকারী নারীদের সহনীয় ক্ষতির চেয়ে বেশি, তাহলে তার জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত চলাকালীন স্থান পরিবর্তন করে ছেলের সঙ্গে বসবাস করা জায়িয হবে, যেখানে তার ছেলে কর্মরত ও বসবাসরত। কেননা শরিয়তের মূলনীতি হচ্ছে, "জরুরি পরিস্থিতি নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে দেয়।" একই ফাতাওয়া প্রদান করেছেন "ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ" (২০/৪৭৩)।

জিজ্ঞাসা (০৭): ***যে নারী স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন করছেন, তিনি কি নখে নেইলপলিশ (মেনিকিউর / মেনিকিউর পলিশ) ব্যবহার করতে পারবেন?***

মাহমুদাহ, মিরপুর, ঢাকা।

জবাব: স্বামীর মৃত্যুর কারণে যে নারী ইদ্দত পালন করছেন, তার জন্য সাজসজ্জা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যেমন-

মেহেদি বা অন্য কোনো রঙ দিয়ে হাত-পা সাজানো, চোখে সুরমা ব্যবহার করা, অলংকার ও আংটি পরা, সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে রঙিন পোশাক পরা ইত্যাদি।

দলিল: ইমাম বুখারী (৫৩৪২) ও মুসলিম (৯৩৮) উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "কোনো নারী কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না; তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। সে রঙিন পোশাক পরবে না... সে সুরমা ব্যবহার করবে না এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে যখন সে পবিত্র হবে, তখন সামান্য কুস্ত (এক ধরনের সুগন্ধি) বা 'আযফার' ব্যবহার করতে পারবে।"

নখে নেইলপলিশ লাগানো সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত। তাই স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনরত নারীর জন্য এটি ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ সুন্নাহতে রং/মেহেদি দ্বারা সাজসজ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ফকীহগণ হাতের ওপর নকশা বা সাজসজ্জা করাও নিষিদ্ধ বলেছেন। তাঁদের কেউ কেউ নখে রঙ বা নেইলপলিশ লাগানোর নিষেধাজ্ঞার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু কুদামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "দ্বিতীয় বিষয় হলো– সাজসজ্জা পরিহার করা। আর এটি অধিকাংশ আলেমের মতে ওয়াজিব। তাঁদের মধ্যে ইবনু 'উমার, ইবনু 'আব্বাস ও 'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ রয়েছেন। আলেমদের একটি বড় জামা'আত এসব সাজসজ্জাকে অপছন্দনীয় বলেছেন এবং তা থেকে নিষেধ করেছেন।"

উম্মু সালামাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: "যে নারীর স্বামী মারা গেছে, সে জাফরান-রঞ্জিত পোশাক এবং লালচে রঙে রঞ্জিত পোশাক পরবে না, অলংকার পরবে না, মেহেদি/রং ব্যবহার করবে না এবং সুরমা ব্যবহার করবে না।" *(আবূ দাউদ- ২৩০৪, সহীহ)*

সারকথা: যে নারী স্বামীর মৃত্যুর কারণে শোক ও ইদ্দত পালন করছেন, তার জন্য শরীরের কোনো অংশে সাজসজ্জা করা জায়িয নয়। এর মধ্যে নখে নেইলপলিশ লাগানোও অন্তর্ভুক্ত।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***আমার স্ত্রী সবসময় আমার প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করে। আমি যখনই তার মুখে চুমু দিতে চাই, সে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়। আমি তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে সে আমাকে দূরে ঠেলে দেয়। আর পোশাকের ব্যাপারে সে সবসময় এমন পোশাক পরে যা তাকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে। আমি যখন তাকে বিছানায় আসতে বলি, সে প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি কখনো রাজি হলেও সে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না; কারণ সে চায় না কেউ তাকে চুমু দিক, সে তার ভেতরের বা বাইরের কোনো পোশাকই খুলতে চায় না। সে কখনো সাজসজ্জাও করে না এবং প্রথমে ঘরের আলো বন্ধ করার দাবি করে। এসব কারণে তার সঙ্গে আমি কোনো আনন্দ বা সুখ অনুভব করি না। প্রায় এক মাস আগে আমি তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছি এবং আমার চাহিদাগুলো তাকে বুঝিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে আমাকে কোনো উত্তর দেয়নি। অথচ আমাদের বিয়ের এক বছরও এখনো পূর্ণ হয়নি। আমি কী করব?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব: মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী, যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, আপনার স্ত্রীর কোনো মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। এটি অস্বাস্থ্যকর লজ্জাশীলতা হতে পারে, আবার অতীতের কোনো অভিজ্ঞতার প্রভাবও হতে পারে, যার কারণে দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতা নিয়ে তার মধ্যে একটি সংকট তৈরি হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া জরুরি।

আপনার স্ত্রী যদি সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিয়ে দিন এবং বুঝান

যে, স্বামীর আনুগত্য করা তার ওপর আবশ্যক যতক্ষণ আপনি তাকে কোনো গুনাহের নির্দেশ না দেন।

স্ত্রীর জন্য স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের আহ্বানে সাড়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় আহ্বান করে, আর সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তখন ফেরেশ্‌তারা সকাল হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।" *(বুখারী- ৩২৩৭)*

তবে স্ত্রী যদি তার অবস্থানে অনড় থাকে, তাহলে সে যেসব মানুষকে ভালোবাসে ও সম্মান করে, তাদের সাহায্য নেওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। হয়তো তারা তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে প্রভাবিত করতে পারবেন। এরপর তার পরিবারের লোকজনেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো– তাকে কোনো বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে চিকিৎসা/কাউন্সেলিং গ্রহণের পর্যায়ে নিয়ে আসা। এ ধরনের সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে এটিই মৌলিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***কিছু লোক, যারা নিজেদেরকে আলেমদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দাবি করে, তারা বলে যে নবী ঘরের কাজে নারীদের সাহায্য করতেন–এ কথা বলা বাতিল, মিথ্যা ও অপবাদ! তাদের দাবি অনুযায়ী, নবী শুধু পুরুষদের উপযোগী কাজই করতেন। তারা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র এই বর্ণনাকে দলিল হিসেবে পেশ করে: "তিনি তাঁর ঘরে পুরুষেরা যে কাজ করে, তা করতেন।" তাদের ব্যাখ্যা হলো, এর দ্বারা বর্তমান যুগের কোনো নষ্ট জিনিস মেরামত করা বা ভারী জিনিস বহন করার মতো কাজ বুঝানো হয়েছে। তারা আরো বলে, নবী কেবল নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলোই করতেন। কিন্তু যখন তাদের সামনে কাজী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ)'র আশ-শিফা গ্রন্থে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), হাসান ও আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখের বর্ণনা পেশ করা হয়, যেখানে নবী (ﷺ)-এর গৃহস্থালির কাজের বিবরণ এসেছে, তখন তারা বলে– এগুলো দুর্বল, তাই এগুলো দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না। আবার অন্য আলেমরা বলেন, ঘর পরিষ্কার করা, রান্না করা, বাসনপত্র ধোয়া ইত্যাদিতে স্ত্রীকে স্বামীর সাহায্য করা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে সঠিক মত কোনটি?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব: নবী (ﷺ)-এর উত্তম চরিত্রের অন্যতম দিক ছিল, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং ঘরের কাজে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা করতেন।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়: "নবী (ﷺ) ঘরের মধ্যে কী কাজ করতেন?" 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: "তিনি তাঁর পরিবারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন (অর্থাৎ- ঘরের কাজে তাদের সহযোগিতা করতেন)। অতঃপর যখন আযান শুনতেন, তখন বের হয়ে যেতেন।" *(বুখারী- ৫৩৬৩)*

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদীসের অধীনে অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন: "অধ্যায়: একজন পুরুষের তার পরিবারের সেবায়/গৃহস্থালির কাজে সহযোগিতা করা।"

এ থেকে বুঝা যায়, ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র অর্থকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত কাজ করা হিসেবে সীমাবদ্ধ করেননি; বরং পরিবারের কাজে সহযোগিতা করাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ বিষয়ে আরো কিছু সহীহ বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো এই সেবার অর্থকে আরো স্পষ্ট করে। যেমন- মুসনাদে আহমাদ (২৪৯০৩)-এ এসেছে, "তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, নিজের জুতা মেরামত করতেন এবং পুরুষেরা সাধারণত তাদের ঘরে যে কাজগুলো করে, সেগুলো করতেন।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তোমাদের কোনো একজন যেমন তার পরিবারের কাজে সহযোগিতা করে, তিনিও তেমনই করতেন। তিনি নিজের জুতা মেরামত করতেন, নিজের কাপড় তালি দিতেন এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন।" *(আহমাদ- ২৪৭৪৯)*

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, "তিনি তো একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন, নিজের ছাগলের দুধ দোহন করতেন, নিজের কাপড় তালি দিতেন এবং নিজের জুতা মেরামত করতেন।" *(ফাতহুল বারী- ৬/১০৮)*

আর যেসব কাজ সাধারণত নারীদের কাজ হিসেবে প্রচলিত যেমন রান্না করা ও ময়দা মাখা এসব কাজ নবী (ﷺ) তাঁর ঘরে করতেন বলে কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।

তবে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ বিষয়ে কাজী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ)'র আশ-শিফা গ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণনা সম্পর্কে হাফিজ ইরাকী (রাহিমাহুল্লাহ) তাখরীজুল ইহইয়া যা ইহইয়া উলূমিদ্দীন-এর প্রান্তে প্রকাশিত গ্রন্থে (৩/৩৫৭) বলেন: "আমি এর কোনো সনদ খুঁজে পাইনি।"

এমনও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, নবী (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন; যেমন- তাঁদের ওযূ করতে সাহায্য করা বা এ ধরনের অন্য কোনো কাজে সহযোগিতা করা; বরং ইবনুল ইরাকী (রাহিমাহুল্লাহ) মনে করেছেন যে, স্ত্রীদের এমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় কাজে নবী (ﷺ) অংশগ্রহণ করতেন, এটি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন: "বুখারীর বর্ণনায় যে 'মিহনাহ' (গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত থাকা)-এর কথা এসেছে, তা আহমদের বর্ণনায় নিজের জুতা মেরামত করা ও নিজের কাপড় সেলাই করা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ: সুন্নাহতে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) তাঁর ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন।

তবে যেসব কাজ প্রচলিতভাবে নারীদের বিশেষ কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো, যেমন ময়দা মাখা ও রান্না করা,

নবী (ﷺ) তাঁর ঘরে এসব কাজ করতেন এমন কোনো সহীহ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আবার, এ ধরনের কাজে স্বামীর স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে এমন কোনো দলিলও নেই। মূলনীতি হলো, এসব কাজ জায়িয; বরং এটি ভালো ও কল্যাণকর কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার অন্তর্ভুক্ত। এমনটাই উল্লেখ করেছেন ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)। *(আদাবুয-যিফাফ ফিস-সুন্নাতিল মুতাহহারাহ- ২৯০)*

জিজ্ঞাসা (১০): ***নবী (ﷺ)-কে 'সাইয়্যিদুল কাওনাইন' (দুই জগতের নেতা/অধিপতি) বলা যাবে কি? দলিলসহ জানতে চাই।*** *মুরাদ, কুমিল্লা।*

জবাব: শরিয়ত মুসলিমকে আমাদের নবী (ﷺ)-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘনের ইঙ্গিত বহন করে এমন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করেছে। তাই তাঁর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে শরিয়তে বর্ণিত শব্দ ও পরিভাষাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কেননা তিনি তাঁর উম্মতকে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী- ৩৪৪৫; আবূ দাউদ- ৪৮০৬)*

নবীর ক্ষেত্রে "সাইয়্যিদুল কাওনাইন (দুই জগতের নেতা)" বা "সাইয়্যিদুল আকওয়ান (সমস্ত জগতের নেতা)" এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করার কোনো প্রমাণ শরঈ দলিলসমূহে এবং সালাফে সালেহীনের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তবে কিছু প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের আলেমদের বক্তব্যে এ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো নবী দুনিয়াবাসী ও আখিরাতবাসীদের নেতা। তাঁরা এ অর্থ গ্রহণ করেছেন রাসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর ভিত্তিতে: "কিয়ামতের দিন আমি মানবজাতির নেতা হব।" *(বুখারী- ৪৪৩৫)*

প্রাচীন যুগের যেসব আলেম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আবূ 'আব্দুল্লাহ আল-ওয়াকিদী, 'ফুতূহুশ শাম' গ্রন্থে (১/৩০১) এবং শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ আল-খুওয়াইয়ী আশ-শাফে'য়ী, তাঁর গ্রন্থ "আকসাল আমাল ওয়াস-সূল ফি ইলমি হাদীসির রাসূল (ﷺ)"-এ। পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে: শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল-হুসাইনি আল-আলূসী, তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (১/১৭৫)। শাইখ হাফিজ ইবনু আহমাদ ইবনু আলী আল-হাকামী, তাঁর গ্রন্থ "মা'আরিজুল কুবূল বি-শারহি সুল্লামিল উসূল" এ (৩/১১৬০)।

সুতরাং, যারা এসব আলেমের অনুসরণে "সাইয়্যিদুল কাওনাইন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন, তাদের ওপর আপত্তি করা উচিত নয়। আর যে ব্যক্তি শরঈ দলিলসমূহে বর্ণিত শব্দ ও উপাধিগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান, তারও সে অধিকার রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (১১): ***যেসব ছাত্রীকে শিষ্টাচার বা শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধন ও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন, তাদের কি শাসন বা প্রহার করা যাবে?*** *আমিনাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

জবাব: শায়খ 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে জিবরীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের জন্য ছোট-বড় সবার সঙ্গে নম্রতা ও কোমল আচরণ করা উত্তম। তবে যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, শাসন বা হালকা ধরনের প্রহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা করা বৈধ। কারণ, নির্বোধ ও অসভ্য ব্যক্তিদের স্বভাব হলো, তারা খারাপ আচরণ করে এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না। ফলে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে কোমলতা ও নম্রতার চেয়ে কঠোরতা ও দৃঢ়তা অধিক কার্যকর হয়।" *(ফাতাওয়া উলামায়িল বালাদিল হারাম- পৃ. ৩৯৯)*

এ বিষয়ে শায়খ 'আব্দুল আজিজ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "এতে কোনো অসুবিধা নেই। শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং অভিভাবক প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং যে ব্যক্তি তার দায়িত্বে অবহেলা করে, তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী শাসন করা। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে সে উত্তম চরিত্রের অভ্যাস গড়ে তোলে এবং সঠিক ও নেক 'আমলের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে সালাতের জন্য তাদের প্রহার করো, আর তাদের শোয়ার স্থান পৃথক করে দাও।' *(মাজমূ' ফাতাওয়া আশ-শায়খ বিন বায- ৬/৪০৩)*

প্রহারের সীমা: রাসূল (ﷺ) বলেন, "মহান আল্লাহর নির্ধারিত কোনো হদের ক্ষেত্রে ছাড়া কাউকে দশ বেত্রাঘাতের বেশি করা যাবে না।" *(বুখারী- ৬৪৫৬)*

"কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রী, দাস, সন্তান অথবা কর্মচারীকে শাসন ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রহার করলে, তার জন্য দশ বেত্রাঘাতের বেশি করা বৈধ নয়। হাদীসটির সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা এভাবেই করা যায়।" *(ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম [রাহিমাহুল্লাহ], ২/২৩)*

অতএব, পড়াশোনা, পড়া প্রস্তুত করা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা ইত্যাদি শিক্ষাগত বিষয়ে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে দশ আঘাতের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

জিজ্ঞাসা (১২): ***Water Proof লিপস্টিক, আইলাইনার ও মেক-আপ দিয়ে ওযূ করলে ওযূ হবে কি?*** *রুবিনা, বরিশাল।*

জবাব: ওযূর অঙ্গের প্রতিটি অংশে পানি পৌঁছানো আবশ্যক। খালিদ ইবনু মাদ'দান থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (ﷺ)-এর কোনো একজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন:

"নবী ( ) একজন লোককে সালাত আদায় করতে দেখলেন। অথচ তার পায়ের পিঠে এক দিরহাম পরিমাণ একটি স্থান ছিল, যেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন নবী ( ) তাকে ওযূ ও সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিলেন।" *(আবূ দাঊদ- ১৭৫, সহীহ)*

চারটি প্রসিদ্ধ ফিকহি মাযহাবই এ বিষয়ে একমত যে, ওযূ সহীহ হওয়ার জন্য ওযূর অঙ্গসমূহে পানি পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে এমন বস্তু অপসারণ করা শর্ত।

অতএব ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ, লিপস্টিক ইত্যাদি যদি ত্বকের ওপর এমন আবরণ তৈরি করে, যার কারণে পানি ত্বকে পৌঁছাতে পারে না, তাহলে ওযূর আগে তা অপসারণ করা আবশ্যক। *(আল-মাওসূ'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ- ৪৩/৩২৯)*

জিজ্ঞাসা (১৩): ***মাহরামের সামনে কতটুকু উঁচু করে চুল বাধা যাবে?***

রুবিনা, বরিশাল।

জবাব: মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীর চুল খোলা রাখা মূলত বৈধ, কারণ মাহরামের সামনে চুল ঢেকে রাখা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে চুল এমনভাবে বাঁধা বা সাজানো উচিত নয়, যাতে তা অশোভন, পুরুষদের অনুকরণ কিংবা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় প্রদর্শনের রূপ নেয়।

মাথার ওপর চুল উঁচু করে বাঁধা মূলত সরাসরি নিষিদ্ধ নয়। তবে কিছু আলেম বিশেষ একটি পদ্ধতিতে চুল উঁচু করে বাঁধাকে নিষিদ্ধ বলেছেন। এর দলিল হলো সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস:

"তাদের মাথাগুলো হবে হেলে থাকা উটের কুঁজের মতো।"

আল-হুমাইদী তাফসীরু গরীবি মা ফিস-সহীহাইন-এ বলেন: "তারা খিমার, পাগড়ি অথবা চুলের সঙ্গে সংযুক্ত চুল (হেয়ার এক্সটেনশন) ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মাথাকে বড় করে তুলবে, ফলে তা উচ্চতায় উটের কুঁজের মতো হয়ে যাবে।"

ইবনুল আরাবী বলেন: "এটি এমনভাবে কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে মাথা বড় করার রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে দর্শকের মনে হয় যে পুরো অংশটাই চুল।"

ইমাম নববী বলেন: "'তাদের মাথাগুলো হেলে থাকা উটের কুঁজের মতো'-এর অর্থ হলো, তারা পাগড়ি, মাথার বন্ধনী অথবা অনুরূপ কোনো জিনিস পেঁচিয়ে মাথাকে বড় ও উঁচু করে তুলবে।"

মূলকথা হচ্ছে, মাথার ওপর চুল বাঁধা বা খোঁপা করা নিষিদ্ধ নয়। নিষেধাজ্ঞা মূলত সেই বিশেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে, যেখানে চুলকে অস্বাভাবিকভাবে উঁচু, বড় ও কুঁজের মতো করা হয়। বিশেষত পাগড়ি, কাপড়, কৃত্রিম চুল ইত্যাদি দিয়ে মাথার আকৃতি বড় করে তোলা।

যদিও উত্তম হচ্ছে, এভাবে না বাঁধা তবে হারাম না।

জিজ্ঞাসা (১৪): ***কোনো অমুসলিম ব্যক্তির জন্য ইসলামের হেদায়াত লাভের দু'আ করা, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে বিয়ে করার জন্য দু'আ করা এর হুকুম কী?***

মায়িশা, বগুড়া।

জবাব: অমুসলিম ব্যক্তির জন্য হেদায়াতের দু'আ করা জায়িয। প্রমাণিত আছে যে, নবী ( ) দাওস গোত্রের জন্য হেদায়াতের দু'আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলে, "হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন।" *(বুখারী- ২৯৩৭)*

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ( ) আবূ হুরাইরাহ্-এর মায়ের জন্য হেদায়াতের দু'আ করেছিলেন।

আল্লামা ইবনু মুফলিহ আল-হাম্বলী ( ) আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ (১/৩৬৮)-এ অমুসলিম ব্যক্তির জন্য কোন ধরনের দু'আ করা বৈধ এবং কোনটি বৈধ নয় এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: "আর হেদায়াত ও এ ধরনের বিষয়ের জন্য দু'আ করা এর বৈধতা সুস্পষ্ট।"

অর্থাৎ- কোনো অমুসলিম ব্যক্তি যেন ইসলাম গ্রহণ করে এবং সঠিক পথে আসে এ উদ্দেশ্যে তার জন্য দু'আ করা শরিয়তসম্মত ও জায়িয। তবে বিয়ের জন্য হেদায়েতের দু'আ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটা তাকে সে কাফেরের দিকে আরো আকর্ষণ করবে এবং হারামের দিকে নিয়ে যাবে। আর যা হারামের দিকে নিয়ে যায় তাও হারাম। নিশ্চয়ই একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্পষ্ট ও নিশ্চিত বিষয়কে ছেড়ে অনিশ্চিত কল্পনার ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করে না।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***জনসম্মুখে একজন বোন তার ভাইদের চুম্বন করার হুকুম কী?***

নাঈম, দোহার, ঢাকা।

জবাব: প্রথমতঃ একজন পুরুষ তার মাহরাম নারীদের যেমন- ফুফু, খালা, মা, দাদি/নানি এবং বোনকে চুম্বন করতে পারে। সাধারণত মাথা, নাক অথবা গালে চুম্বন করতে পারবে।

মানুষ সমাজে যেভাবে অভ্যস্ত, সে অনুযায়ী হতে পারে। তবে ঠোঁটে চুম্বন করা (স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যতীত) অধিকাংশ আলেম অপছন্দনীয় (মাকরূহ) বলেছেন।

অনুরূপভাবে, কোনো মাহরাম নারী যেমন বোন, ফুফু বা খালা তার মাহরাম পুরুষকে মাথা বা গালে চুম্বন করতে পারে। তবে এটিকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করা উচিত নয়; বরং কেউ সফর থেকে ফিরে এলে বা এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে চুম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু সর্বদা চুম্বন করাকে শরিয়তসম্মত অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো উভয় পক্ষের ফিতনার আশঙ্কা না থাকা। ইবনু মানসুর ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: "কোনো ব্যক্তি কি তার মাহরাম নারীদের চুম্বন করতে পারে?"

তিনি বললেন: “যদি সে সফর থেকে ফিরে আসে এবং তার নিজের ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা না থাকে।”

এরপর তিনি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন যে, নবী (ﷺ) কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে চুম্বন করেছিলেন। *(আল-ফুরূ‘- ৮/১৯১)*

দ্বিতীয়তঃ জনসম্মুখে চুম্বন করা: মানুষের সামনে বা জনসমাগমের স্থানে চুম্বন করা উচিত নয়। কারণ এটি শিষ্টাচারের পরিপন্থী এবং লজ্জাশীলতার পরিপন্থী।

এমনকি আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, স্বামী-স্ত্রীও মানুষের সামনে একে অপরকে চুম্বন করা অপছন্দনীয়, কারণ এটি একজন মুসলিমের জন্য অনুচিত। এটি মার্জিত রুচি ও শালীনতার পরিপন্থী। আর যদি এমন কোনো জনসম্মুখস্থ স্থান হয়, যেখানে উপস্থিত মানুষ জানে না যে তারা ভাই-বোন বা মাহরাম, তাহলে অপছন্দনীয়তা আরো বেশি; কারণ এতে তাদের সম্পর্কে কুধারণার দরজা খুলে যেতে পারে। শরীয়তের বিধান হচ্ছে, সন্দেহের স্থান থেকে বিরত থাকতে হবে। *(বুখারী- ২০৩৫)* আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

জিজ্ঞাসা (১৬): ***গাইরে মাহরামের জন্য বৃদ্ধা মৃত নারীর মুখের দিকে তাকানোর হুকুম কী?*** *হুমাইদ, লালমনিরহাট।*

জবাব: আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই সম্মানিত ও মর্যাদাশীল করেছেন। আল্লাহ মহান বলেন: “নিশ্চয়ই আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।” *(সূরা আল-ইসরা: ৭০)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় তার হাড় ভাঙার মতোই।” *(আহমাদ- ২৪৭৩০; আবূ দাঊদ- ৩২০৭, সহীহ)*

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বারী (৯/১১৩)-তে বলেন: “এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একজন মু’মিনের মৃত্যুর পরও তার সম্মান ও মর্যাদা তার জীবিত অবস্থার মতোই বহাল থাকে।”

আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ-এর ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে– “মৃত ব্যক্তির সতর দেখা, জীবিত অবস্থায় তার সতর দেখার মতোই।” *(১ম সংস্করণ- ২৪/৪২৩)*

শরীয়তের মূলনীতি হলো, মৃত মুসলিম নারীর মুখের দিকে তাকানো নারীরা অথবা তার মাহরাম পুরুষরা ছাড়া অন্য পুরুষদের জন্য জায়িয নয়। অর্থাৎ- গায়রে মাহরাম পুরুষদের জন্য এটি জায়িয নয়। *(বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ইবনু রুশদ, ১/২৪১; আল-মুগনী- ইবনু কুদামাহ, ২/৩৭৪, ৩৯১)*

তবে মৃত বৃদ্ধা নারীর মুখের দিকে গায়রে মাহরাম পুরুষ তাকালেও কোনো গুনাহ হবে না এমনটাই প্রকাশ্য মত বলে মনে হয়। জীবিত অবস্থায়ও এ ধরনের বৃদ্ধ নারীর মুখের দিকে তাকানো বৈধ। সুতরাং মৃত্যুর পরও তাঁর মুখের দিকে তাকাতে অসুবিধা নেই। *(সূরা আন্-নূর: ৬০)*

তবে নারী ও মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্যদের তাঁর মুখ না দেখাই উত্তম।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***সূরা মুলক কি কিয়ামতের দিন তার পাঠকারী/যিনি তা পাঠ করেন, তাকে নাজাত দেবে?***

আব্দুল্লাহ আল মামুন, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: সূরা আল-মুলক কবরের ‘আযাব থেকে রক্ষা করে এবং কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: “সূরা তাবারকা (অর্থাৎ- সূরা আল-মুলক) কবরের ‘আযাব থেকে রক্ষাকারী।” *(আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ্- ১১৪০)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “এটি (সূরা আল-মুলক) প্রতিরোধকারী, এটি নাজাতদানকারী; এটি তাকে কবরের ‘আযাব থেকে রক্ষা করবে।” *(তিরমিযী- ২৮৯০, সহীহ)*

নবী (ﷺ) বলেছেন: “কুরআনের একটি সূরা আছে, যার আয়াত সংখ্যা ত্রিশটি। এটি তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করতে থাকবে, অবশেষে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সেটি হলো– ‘তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক’ (সূরা আল-মুলক)।” *(তিরমিযী- ২৮৯১, সহীহ)*

উল্লিখিত দলিল প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, যে নিয়মিত সূরা আল-মুলক পাঠ করবে তা তাকে কিয়ামতের দিন রক্ষা করবে ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (১৮): ***“যে ব্যক্তি তাওফীক্ব বা সাফল্যতা লাভ করতে চায়, সে যেন নিয়মিত সূরা আশ-শামস পাঠ করে। তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে সে যেদিকেই যায়, তাওফীক্ব দান করবেন। এতে আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে; যেমন হেফাজত এবং সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ। এ কথাটি কতটুকু সহীহ? মূলত এটি কি কোনো হাদীস?”*** *শারমিন, বগুড়া।*

জবাব: **প্রথমতঃ** এই অর্থের কোনো বর্ণনা বা হাদীসের সন্ধান আমরা পাইনি। অনুরূপভাবে, সূরা আশ্-শামস পাঠ করা বা মুখস্থ করার বিশেষ কোনো ফযীলাত সম্পর্কে আমরা কোনো হাদীস বা সাহাবি/সালাফের কোনো আসারও পাইনি।

দ্বিতীয়তঃ সূরা আশ-শামস একটি মহান মর্যাদাপূর্ণ সূরা। এর শুরু হয়েছে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর ধারাবাহিক কয়েকটি শপথের মাধ্যমে। তিনি তাঁর মহান সৃষ্টিসমূহের শপথ করেছেন যেগুলো মানুষের সামনে দৃশ্যমান এবং তাঁর মহত্ত্ব, ক্ষমতা, সৃষ্টিজগতের পরিচালনা, তাদের প্রতি তাঁর রবুবিয়্যাহ এবং তাদের বিষয়-ব্যবস্থা সংশোধনের নিদর্শন।

এর মাধ্যমে মানুষের জীবন ও তার রবের প্রতি বান্দেগির ক্ষেত্রে একটি মহান সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে– "নিশ্চয়ই আত্মার পরিশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নাফস) সফলতার কারণ; আর আত্মার সংশোধনে অবহেলা করা পাপাচার ও ক্ষতির কারণ।" *(আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর- ৩০/৩৬৬)*

জিজ্ঞাসা (১৯): ***স্বামী যদি কোনো বিনিময় عوض ছাড়াই এবং কোনো সাক্ষী ছাড়াই স্ত্রীর সঙ্গে খুলা (خلع) করে, তাহলে কি সেই খুলা সহীহ/শুদ্ধ হবে?*** *মাহমুদ, কুড়িগ্রাম।*

জবাব: স্বামী যদি কোনো বিনিময় গ্রহণ না করেই স্ত্রীর সঙ্গে খুলা (خلع) করে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে খুলা সহীহ হবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "বিনিময় ছাড়া খুলা সহীহ হবে কি না এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদের দু'টি মত রয়েছে। একটি মত আবূ হানীফাহ্ ও শাফে'য়ীর মত; তাঁর অধিকাংশ অনুসারীও এটি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ- বিনিময় ছাড়া খুলা সহীহ নয়। দ্বিতীয় মত হলো এটি সহীহ; এটি ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত এবং আল-খিরাকীও এটি গ্রহণ করেছেন।" *(মাজমূ' ফাতাওয়া- ৩২/৩০৩)*

শাইখ 'আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "খুলার ক্ষেত্রে, যেমন- আলেমগণ বলেছেন, বিনিময় থাকা আবশ্যক; কারণ এটিই খুলার মূল ভিত্তি। যখন বিনিময় থাকে না, তখন সেটি খুলা নয়; বরং স্বামী যদি এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করে থাকে, তাহলে এটি তালাকে রজ'ঈ হবে।" *(আল-ফাতাওয়াস সা'দিয়্যাহ- পৃ. ৩৬২)*

তবে কিছু আলেমের মত: কিছু আলেম বলেছেন, বিনিময় ছাড়াও খুলা সহীহ হবে। এটি ইমাম আহমদের একটি বর্ণিত মত এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এটিই গ্রহণ করেছেন। *(আল-মুস্তাদরাক 'আলা মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম- ৪/২২৩)*

শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-ও এ মতটি উল্লেখ করে বলেন, বিনিময় ছাড়া খুলা সহীহ নয়–এটি মাযহাবের মত। *(আশ-শারহুল মুমতি'- ১২/৪৭৬)*

সুতরাং বিনিময় ছাড়া খুলা সহীহ হবে কি না এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই এমন পরিস্থিতিতে সতর্কতার দিক থেকে স্ত্রী কোনো বিনিময় প্রদান করে খুলা নেওয়াই উত্তম, যাতে মতভেদ থেকে বেরিয়ে আসা যায় এবং নিশ্চিতভাবে বৈবাহিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

খুলার সময় সাক্ষী থাকা কি জরুরি?

না। খুলার জন্য সাক্ষী থাকা আবশ্যক নয়।

অতএব, স্বামী যদি কোনো সাক্ষী উপস্থিত না রেখেও স্ত্রীর সঙ্গে খুলা সম্পন্ন করে, তাহলে সাক্ষী না থাকার কারণে খুলা বাতিল হবে না। *(আল-মাজমূ'- ৯/১৯৫; আল-ইনসাফ- ৯/১১২)* মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

জিজ্ঞাসা (২০): ***একজন নারী তার প্রথম স্বামীর সম্মতি ছাড়াই নিজের পক্ষ থেকে খুলা (خلع) গ্রহণ/সম্পন্ন করেছে, এরপর অন্য একজনকে বিয়ে করেছে। পরে সে আবার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে এসেছে এর হুকুম কী?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জবাব: তুমি যে খুলা নিজের পক্ষ থেকে একতরফাভাবে করেছ, তা বাতিল; এর কোনো শরয়ি প্রভাব নেই। কারণ, একজন নারী নিজে থেকে বিবাহবন্ধন বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না। খুলার মাধ্যমে হোক বা তালাকের মাধ্যমে হোক। যেমন- সে নিজে থেকে বিবাহবন্ধন সম্পন্ন করার ক্ষমতাও রাখে না; বরং কোনো নারীর যদি এমন কোনো কারণ থাকে, যার কারণে সে স্বামীর কাছ থেকে খুলা চাইতে পারে, তাহলে সে স্বামীর কাছে খুলা চাইবে। স্বামী সম্মত হলে তিনিই খুলা বা তালাক কার্যকর করবেন। আর স্বামী সম্মত না হলে নারী বিষয়টি শরয়ি বিচারকের (কাজীর) কাছে উত্থাপন করবে। তখন বিচারক হয় স্বামীকে খুলা বা তালাক দিতে বাধ্য করবেন, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী তা করবেন না।

অতএব, কোনো নারী যদি প্রথম স্বামীর সঙ্গে বৈধভাবে বিচ্ছেদ না ঘটার আগে অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে সমস্ত আলেমের ঐকমত্য অনুযায়ী তার দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল। যদি সে জেনে-শুনে এই বাতিল বিবাহ করে থাকে, তাহলে সে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার ওপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে বিষয়টি না জানত, অথবা তার ধারণা ছিল যে নিজের পক্ষ থেকে খুলা করার অধিকার তার রয়েছে এবং তার করা খুলা কার্যকর হয়ে গেছে, তাহলে অজ্ঞতার কারণে সে অজুহাতপ্রাপ্ত হবে এবং তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না।

তবে তার দ্বিতীয় বিবাহও বাতিল। তাই তাকে দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হতে হবে এবং তার কাছ থেকে ইদ্দত পালন করতে হবে। এরপর সে চাইলে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। *(আল-মুগনী, ৭/১৩)*

সারকথা: সব অবস্থাতেই একজন নারী নিজে থেকে একতরফাভাবে তার স্বামীর কাছ থেকে খুলা গ্রহণ করতে পারে না, যেমনটি তুমি করেছ।

অতএব, ওই মিথ্যাবাদী ও প্রতারণাকারী ব্যক্তির সঙ্গে তোমার দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল; এর কোনো শরয়ি কার্যকারিতা নেই।

তোমার ওপর আবশ্যক হলো, তালাকপ্রাপ্তা নারীর মতো তার কাছ থেকে বিচ্ছেদের পর ইদ্দত পালন করা।

তবে কিছু আলেমের মত হলো, এক্ষেত্রে একবার মাসিক (হায়েয) হওয়ার মাধ্যমে জরায়ু খালি/গর্ভমুক্ত হওয়া নিশ্চিত করাই যথেষ্ট। *(দেখুন: আশ-শারহুল মুমতি‘- ১৩/৩৮১-৩৮৩)*

জিজ্ঞাসা (২১): ***আমার চাচাতো বোন একজন শিয়া ব্যক্তিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কী?*** *আব্দুর রহমান, ঢাকা।*

জবাব: যে শিয়া আলী, হাসান, হুসাইনকে ডাকে বা তাদের কাছে সাহায্য চাই সে কাফির। অনুরূপভাবে বর্তমানে রাফেজী শিয়া তারাও কাফির। তাই তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। *(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ২/২৬৪)*

জিজ্ঞাসা (২২): ***চার, পাঁচ বা ছয় বছর বয়সী ছোট শিশুরা, যারা এখনো ওযূ করার নিয়ম জানে না, তারা কি মুখস্থ করা বা শেখার উদ্দেশ্যে ওযূ ছাড়াই কুরআন স্পর্শ করতে পারবে?*** *সানাউল্লাহ, রাজশাহী।*

জবাব: শিশুদের মুখস্থ করা ও শেখার উদ্দেশ্যে ওযূ ছাড়া কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ করা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমের (জমহুরের) মত হলো, এটি জায়িয। আল-মাওসু‘আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ-তে বলা হয়েছে–

হানাফীরা: শেখা ও মুখস্থ করার প্রয়োজনে শিশু ওযূ ছাড়াই কুরআনের মুসহাফ বা কুরআনের লেখা ফলক স্পর্শ করতে পারবে। কারণ শিশুর ওপর পবিত্রতার বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে শিষ্টাচার ও অভ্যাসের জন্য তাদের ওযূ করতে বলা হয়।

ইমাম মালিক: আশা করা যায়, শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুদের ওযূ ছাড়া মুসহাফ স্পর্শ করা জায়িয।

শাফে‘য়ীরা: বুঝদার শিশুকে শেখার প্রয়োজন ও সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকার কষ্টের কারণে মুসহাফ বা কুরআনের ফলক স্পর্শ ও বহন থেকে নিষেধ করা হবে না।

হাম্বলিরা: মক্তবের শিশুদের কুরআনের লেখা ফলক স্পর্শের ব্যাপারে দু’টি মত রয়েছে। একটি মত হলো, প্রয়োজনের কারণে তা জায়িয। কারণ ওযূ শর্ত করে দিলে শিশুদের কুরআন মুখস্থ করা থেকে অনাগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। *(আল-মাওসু‘আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ- ৩৭/২৭৮)*

সারকথা: অধিকাংশ আলেমের মত হলো– শিশুদের শেখা ও মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে ওযূ ছাড়াই মুসহাফ স্পর্শ করা জায়িয।

এ ক্ষেত্রে শিশু বুঝদার হোক বা অবুঝ হোক, উভয়ের ক্ষেত্রেই জমহুরের মত অনুযায়ী অনুমতি রয়েছে।

এ মতটি মানুষের জন্য তুলনামূলক সহজ এবং নতুন প্রজন্মকে কুরআনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্যও অধিক সহায়ক। এটি জমহুর আলেমের মত।

জিজ্ঞাসা (২৩): ***সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পর তার মাঝে মাঝে রক্তপাত হয়। এ অবস্থায় সে সালাত ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে কী করবে?*** *নাইলা ডেমরা, ঢাকা।*

জবাব: যদি রক্ত ৪০ দিনের মাঝে হয় এবং পবিত্রতার আলামত বা চিহ্ন না পায় তাহলে তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে। পবিত্রতার আলামত ২টি। যথা-

প্রথম: সাদা স্রাব/সাদা তরল বের হওয়া।

দ্বিতীয়: সম্পূর্ণ শুষ্কতা অর্জিত হওয়া– অর্থাৎ- রক্ত, হলুদাভ স্রাব বা মেটে/বাদামি স্রাব এর কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকা।

এভাবে যদি ধারাবাহিকভাবে রক্তপাত চলতে থাকে, কিন্তু তুমি পূর্বে উল্লেখিত দু’টি আলামতের কোনো একটি দ্বারা পবিত্রতা দেখতে না পাও, তাহলে ৪০ দিনের সময়সীমার মধ্যে পুরো রক্তপাতই নিফাস হিসেবে গণ্য হবে।

রক্তপাত এক দিন বা দিনের কিছু অংশের জন্য বন্ধ হয়ে গেলেই তা পবিত্রতা হিসেবে গণ্য হবে না; বরং পবিত্রতা তখনই গণ্য হবে, যখন সম্পূর্ণ শুষ্কতা অর্জিত হবে অথবা সাদা স্রাব দেখা যাবে।

জিজ্ঞাসা (২৪): ***আমি খাবার খেয়েছিলাম এবং ‘আসরের সালাতের আগে কিছু চা পান করেছিলাম। সালাতের সময়, বিশেষ করে রুকূ‘ অবস্থায়, আমার ঢেঁকুর উঠল। তখন বমির মতো সামান্য কিছু তরল আমার মুখের মাঝখানে উঠে এলো। আমি সেটি মুখ থেকে বের করে দিলাম এবং আমার জামার এক প্রান্ত দিয়ে মুছে ঘষে পরিষ্কার করে ফেললাম। আমার সালাত কি শুদ্ধ হয়েছে?*** *হাসান রাজবাড়ী।*

জবাব: ঢেঁকুর ওঠার সময় আপনার পাকস্থলী থেকে যে তরল পদার্থটি বের হয়েছে, তাকে قَلَس (ক্বালাস) বলা হয়। এটি বমির মতো, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান বমির তুলনায় কিছুটা হালকা। এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দু’টি বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে– **১.** এটি পাক না অপবিত্র? **২.** এটি ওযূ ভঙ্গ করে কি না? তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি পাক এবং এর কারণে ওযূ নষ্ট হয় না।

শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) আল-কাফী-এর ব্যাখ্যায় (৩/১৭৭) বলেন: “বমি অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারেও কোনো দলিল নেই। আর এটা জানা কথা যে, মানুষের মাঝে বমি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও প্রচলিত বিষয়। যদি বমি অপবিত্র হতো, তাহলে তা কীভাবে পাক করতে হবে, এ বিষয়ে বর্ণনা করার যথেষ্ট প্রয়োজন দেখা দিত। অথচ ছোট শিশুরা তাদের মায়েদের সামনে বমি করে থাকে; কিন্তু নবী (ﷺ) থেকে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি তাদের

বমি ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, পেশাব ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর বিধান স্পষ্ট করেছেন।"

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: "ক্বালাস (القَلَس)-এর ব্যাপারে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি ওযূ ভঙ্গ করে না যদিও এটিকে অপবিত্র (নাজিস) হিসেবে ধরা হয়।" *(ফাতাওয়া শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইব্রা-হীম- ২/৭৪)*

অর্থাৎ- এমনকি আমরা যদি কালাসকে অপবিত্রও মনে করি, তবুও এর কারণে ওযূ নষ্ট হবে না।

সুতরাং এর ভিত্তিতে বলা যায়: আপনার সালাত সহীহ হয়েছে, ইন্ শা-আল্লাহ।

জিজ্ঞাসা (২৫): ***সালাতে এদিক-সেদিক তাকানোর বিধান কি? এতে কি সালাত বাতিল হয়ে যায়?*** *আবু সালেহ কুষ্টিয়া।*

জবাব: সালাতে ইলতিফাত (الالتفات) বা এদিক-সেদিক তাকানোর কয়েকটি ধরন রয়েছে–

১. বুক/শরীর ঘুরিয়ে কিবলার দিক থেকে সরে যাওয়া: এভাবে যদি বুক কিবলার দিক থেকে ঘুরে যায়, তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সালাত শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো কিবলামুখী হওয়া।

২. শুধু মাথা বা চোখ ঘুরিয়ে তাকানো, অথচ শরীর কিবলামুখী থাকা: এ ধরনের ইলতিফাত মাকরূহ। তবে কোনো প্রয়োজনের কারণে করলে তাও মাকরূহ নয়। *(বুখারী- ৬৮৪)*

আর যদি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই এভাবে তাকানো হয়, তাহলে সালাতের সওয়াব কমে যাবে; তবে সালাত বাতিল হবে না। *(বুখারী- ৭৫১)*

আল-মাওসু'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ (২৭/১০৯)-তে বলা হয়েছে– "সালাতে ইলতিফাত করা মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। রাসূল (ﷺ)-কে ইলতিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন: 'এটি এমন এক দৃষ্টিশক্তি ছিনতাই, যা শয়তান বান্দার সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।' (বুখারী- ৭৫১) তবে প্রয়োজন বা ওজর না থাকার ক্ষেত্রে এই মাকরূহের বিধান প্রযোজ্য। আর যদি কোনো প্রয়োজন থাকে যেমন নিজের জীবন বা সম্পদের ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে তাহলে এভাবে তাকানো মাকরূহ নয়।

জিজ্ঞাসা (২৬): ***সালাতের তাকবিরে তাহরিমার আগে 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলা কি জায়িয?*** *হামদান, ঢাকা।*

জবাব: না, জায়িয নয়। সালাতে বিস্‌মিল্লাহ পড়ার স্থান হলো, তাকবিরে তাহরিমা, দু'আয়ে ইস্তিফতাহ (সানা) এবং ইস্তিআযাহ (আউযুবিল্লাহ) পড়ার পর, সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠের আগে।

আর সালাত শুরু করার আগে, অর্থাৎ- তাকবিরে তাহরিমার পূর্বে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো যিক্‌র বা দু'আ প্রমাণিত নেই। সুতরাং তাকবিরে তাহরিমার আগে নিয়মিতভাবে 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। *(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- প্রথম সংকলন, ৬/৭৪)*

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন বলতেন: 'আল্লাহু আকবার'। তিনি এর আগে (অর্থাৎ- তাকবিরে তাহরিমার আগে) কোনো কিছু বলতেন না।" *('যাদুল মা'আদ'- ১/১৯৪)*

জিজ্ঞাসা (২৭): ***একজন মুসলিম নারী কি তার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছোট করতে পারবে, নাকি পারবে না? আর মুখে গজানো চুলের ব্যাপারে বিধান কী? তা অপসারণ করা কি হারাম, নাকি হারাম নয়?*** *জান্নাতী, চাঁদপুর।*

জবাব: আপনার প্রশ্নের মধ্যে দু'টি বিষয় রয়েছে। যথা-

প্রথম বিষয়– মাথার চুল ছোট করার বিধান: শায়খ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: "নারীর চুল কাটা সম্পর্কে আমরা এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা জানি না। নিষেধ করা হয়েছে মাথার চুল সম্পূর্ণ মুণ্ডন করা। তবে চুলের দৈর্ঘ্য বা অতিরিক্ত ঘনত্বের কারণে কিছুটা কেটে নিলে এতে কোনো অসুবিধা আছে বলে আমরা জানি না।

তবে চুল কাটার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত, যা সুন্দর ও শোভন। আর চুল কাটার ক্ষেত্রে কোনো কাফির নারীর অনুকরণ করা যাবে না। তবে কোনো কারণ ও রোগের প্রয়োজন ছাড়া মাথার চুল সম্পূর্ণ মুণ্ডন করা জায়িয নয়।" *(ফাতাওয়া আল-মারআতিল মুসলিমাহ- ২/৫১৫)*

এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমে আবূ সালামাহ ইবনু 'আব্দুর রহমান (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে বর্ণিত হয়েছে– "নবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের মাথার চুল থেকে কিছু অংশ কেটে নিতেন, এমনকি তা 'ওফরাহ'-এর মতো হয়ে যেত।" *(মুসলিম- কিতাবুল হায়িয, ৩২০)*

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন: "এতে নারীদের চুল হালকা করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে।"

দ্বিতীয় বিষয়– মুখের লোম অপসারণের বিধান: শায়খ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, "নারীর শরীরে যদি এমন অস্বাভাবিক লোম গজায়, যা সাধারণত সেখানে গজায় না। যেমন নারীর গোঁফ গজানো অথবা গালে লোম গজানো তাহলে তা অপসারণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এটি স্বাভাবিকতার বিপরীত এবং নারীর সৌন্দর্য বিকৃত করে।" *(ফাতাওয়া আল-মারআতিল মুসলিমাহ- ২/৫৩৬-৫৩৭)*

নারীর মুখের লোম অপসারণ সম্পর্কে স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি *(আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ)*-কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা উত্তর দেন: "নারীর গোঁফ, উরু, পা ও বাহুর লোম

অপসারণে কোনো অসুবিধা নেই। এগুলো নিষিদ্ধ 'নামস' (ভ্রু উপড়ানো)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" *(ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ- ৫/১৯৪-১৯৫)*

জিজ্ঞাসা (২৮): ***শরিয়তে ব্যবসায় কতটুকু লাভ করা বৈধ? দলিলসহ জানতে চাই।*** *আল আমিন, নরসিংদী।*

জবাব: শরিয়তে লাভের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। তাই চাইলে আপনি ৩৫ টাকার পণ্য ৫০ টাকায়, অথবা ১৫ টাকার পণ্য ৫০ টাকায় বিক্রি করতে পারেন।

অতএব কোনো ব্যবসায়ী ৫০%, ১০০% বা তার চেয়েও বেশি লাভ করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যেন পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করে, ক্রেতাকে প্রতারণা না করে এবং ক্রেতার দামের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে না ঠকায়।

লাভের নির্দিষ্ট সীমা না থাকার প্রমাণ: 'উরওয়াহ্ আল-বারিকী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে একটি বকরী কেনার জন্য একটি দিনার দিয়েছিলেন। তিনি সেই এক দিনার দিয়ে দু'টি বকরী কিনলেন। এরপর একটি বকরী এক দিনারে বিক্রি করে দিলেন এবং অপর বকরী ও এক দিনার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে নিয়ে এলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন: "আল্লাহ তা'আলা তোমার হাতের ব্যবসায় বরকত দান করুন।"

এরপর 'উরওয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন ব্যবসা করতেন যে, তিনি বিপুল পরিমাণ লাভ করতেন এবং কুফাবাসীদের মধ্যে অন্যতম ধনী ব্যক্তি হয়ে গিয়েছিলেন। *(তিরমিযী- ১২৫৮, সহীহ)*

এখানে দেখা যায়, 'উরওয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রায় অর্ধ দিনারে একটি বকরী কিনে এক দিনারে বিক্রি করেছিলেন। অর্থাৎ- প্রায় ১০০% লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর এ কাজকে অনুমোদন করেছেন এবং তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করেছেন।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আল-গাবাহ' নামক জমি ১,৭০,০০০-এ ক্রয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে 'আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সেটি ১৬,০০,০০০-এ বিক্রি করেন। অর্থাৎ- ক্রয়মূল্যের নয় গুণেরও বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছিল। *(বুখারী- ৩১২৯)*

তবে বেশি লাভ করা বৈধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে প্রতারণা, ধোঁকা, মজুতদারি, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, মিথ্যা তথ্য দেওয়া বা ক্রেতার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে মূল্য আদায় করা বৈধ। এগুলো পৃথকভাবে নিষিদ্ধ। তবে লাভ করার সময় নিম্নোক্ত হাদীস মনে রাখা উচিত,

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালোবাসে।" *(বুখারী- ১৩)*

জিজ্ঞাসা (২৯): ***হাদীসে বর্ণিত 'মু'আসফার' পোশাক বলতে কী বুঝায় ও এটার বিধান কি?*** *তাহমিম, নাটোর।*

জবাব: মু'আসফার' বলতে এমন কাপড় বুঝায়, যা 'উসফুর' বা কুসুম ফুল (Safflower) নামক উদ্ভিদ দিয়ে রঞ্জিত করা হয়েছে। এটা সাধারণত লাল রং হয়। এ বিষয়ে আলেমদের তিনটি মত রয়েছে। যথা-

প্রথম মত: হারাম। এটি জাহিরিয়াহ মাজহাব এবং ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)-এর পছন্দনীয় মত। *(সহীহ মুসলিম- ২০৭৭)*

দ্বিতীয় মত: মাকরূহ। এটি হানাফি ও মালিকি মাজহাবের মত এবং হাম্বলি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য মত।

তাঁরা বলেন, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা হারামের পরিবর্তে মাকরূহ অর্থে নেওয়া হবে। কারণ বারা ইবনু আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি নবী (ﷺ)-কে একটি লাল জোড়া পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।" *(বুখারী- ৩৫৫১)*

তৃতীয় মত: জায়িয। এটি শাফে'য়ী মাজহাবের মত। তবে মু'আসফার পোশাক হারাম হওয়ার মতটি গ্রহণযোগ্য। কারণ নিষেধাজ্ঞার মূলনীতি হলো তা হারাম বুঝায়। আর নবী (ﷺ) লাল পোশাক পরেছেন –এটি প্রমাণ করে না যে সেটি অবশ্যই 'উসফুর' দিয়ে রঞ্জিত ছিল; বরং তা অন্য কোনো উপায়ে লাল রঙে রঞ্জিত হতে পারে। পুরুষের পোশাকের তিনটি রঙ নিয়ে আলেমদের মতভেদ।

জিজ্ঞাসা (৩০): ***পুরুষ কোন রঙ্গের কাপড় পড়তে পারবে না? দলিলসহ জানতে চাই।*** *রায়হান, নিলফামারী।*

জবাব: পুরুষের জন্য তিন ধরনের রঙের পোশাক নিয়ে ফকিহদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। যথা-

১. খাঁটি লাল রঙ, যার সঙ্গে অন্য কোনো রঙ মিশ্রিত নয়। তবে লালের সঙ্গে অন্য রঙ মিশ্রিত হলে তা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে।

২. উসফুর' বা কুসুম নামক উদ্ভিদ দিয়ে রঞ্জিত পোশাক। একটি পরিচিত উদ্ভিদ, যার মাধ্যমে লাল রঙ করা হতো।

৩. জাফরান দ্বারা রঞ্জিত পোশাক। জাফরান একটি উদ্ভিদ, যা হলুদ রঙ প্রদান করে। তবে অন্য উপায়ে হলুদ রঙ করা হলে তা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে।

সুতরাং উসফুর বা কুসুম ফুল ও জাফরান দিয়ে রজ্জিত কাপড় পুরুষ পরিধান করবে না। এছাড়া অন্য কিছু দিয়ে রঞ্জিত লাল/হলুদ বা অন্য কোনো রঙের পোশাক পরিধান করতে কোনো বাঁধা নেই ইন্ শা-আল্লাহ।

সাপ্তাহিক আরাফাত/عرفات أسبوعية
৬৭ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ॥ ৩১ আগস্ট-২০২৬ ঈ.

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি

মালাগার মসজিদে আন্দালুসের জীবন্ত স্মৃতি

আবু ফাইয়ায

স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের আন্দালুসিয়া অঞ্চল মুসলিম সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। কর্ডোবা, গ্রানাডা ও সেভিয়ার মতো শহরে আজও সেই সময়ের স্থাপত্য ও সংস্কৃতির নানা স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়। আধুনিক মালাগার 'আন্দালুসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' যা সাধারণভাবে মালাগার মাসজিদ নামে পরিচিত- সেই ঐতিহ্যের একটি আধুনিক প্রকাশ। এটি কোনো মধ্যযুগীয় স্থাপনা নয়; বরং বর্তমান সময়ে নির্মিত একটি মাসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যার স্থাপত্যে আন্দালুসের স্মৃতি নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মসজিদটির নির্মাণের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ এক ইতিহাস। কেন্দ্রটির নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, ভবনটি সৌদি রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন ফাহাদের অর্থায়নে নির্মিত হয়। ২০০৩ সালে ভবনটি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয় এবং ২০১৪ সালে এটি Muslim World League-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়। অন্যদিকে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে এর কার্যক্রম ২০০৭ সালে শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, নির্মাণ ও পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরুর মধ্যে কয়েকটি পৃথক ধাপ ছিল।

মসজিদটির নির্মাণ প্রকল্প ছিল বেশ বড়। ২০০৭ সালে স্পেনের সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে প্রায় ৩,৮২৫ বর্গমিটার জমি এবং ২২ মিলিয়ন ইউরোর বেশি ব্যয়ের কথা বলা হয়েছিল। নির্মাণকাজেও দীর্ঘসূত্রতা ছিল। বিশেষ করে আরবী অলংকরণ ও শিলালিপির কাজে দক্ষ কারিগর পাওয়ার বিষয়টি প্রকল্পকে সময়সাপেক্ষ করে তোলে।

স্থাপত্যের দিক থেকে মসজিদটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো আন্দালুসি প্রভাব। ভবনের ভেতরে অশ্বক্ষুরাকৃতির খিলান ব্যবহার করা হয়েছে, যা আন্দালুসের ইসলামি স্থাপত্যের অন্যতম পরিচিত বৈশিষ্ট্য। এসব খিলান কর্ডোবার ঐতিহাসিক মসজিদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে মালাগার ভবনটি কোনো প্রাচীন স্থাপনার হুবহু অনুলিপি নয়; বরং পুরোনো স্থাপত্যরীতির আধুনিক প্রয়োগ।

মসজিদের অভ্যন্তরে স্পেনের আলমেরিয়া অঞ্চলের বিখ্যাত মাকায়েল সাদা মার্বেল ব্যবহার করা হয়েছে। সাদা মার্বেলের সঙ্গে মোজাইক, আরবী ক্যালিগ্রাফি ও জ্যামিতিক নকশা মিলিয়ে ভেতরের পরিবেশকে নান্দনিক করে তোলা হয়েছে। মিহরাবের আশপাশের অলংকরণও ভবনের অন্যতম আকর্ষণ।

মসজিদের প্রধান প্রাঙ্গণে রয়েছে পানি ও ফোয়ারা। ইসলামি স্থাপত্যে পানি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও প্রশান্তির সঙ্গে যুক্ত। এই প্রাঙ্গণের ওপর রয়েছে প্রায় ১৫ টন ওজনের একটি বিশাল কাঠের ছাদ। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছাদটি সরিয়ে প্রাঙ্গণকে আকাশের দিকে উন্মুক্ত করা যায়। ঐতিহ্যবাহী কাঠের কাজের সঙ্গে আধুনিক প্রকৌশলের এই সমন্বয় ভবনটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বাইরের দিক থেকে মসজিদের সবচেয়ে দৃশ্যমান অংশ- প্রায় ২৫ মিটার উঁচু মিনার। মিনারটি ভবনের ইসলামি পরিচয়কে স্পষ্ট করেছে। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, বর্তমানে এখান থেকে আযান দেওয়া হয় না।

মসজিদটি শুধু সালাতের স্থান নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাকেন্দ্রও। এখানে আরবী ভাষা, ইসলামি শিক্ষা ও কুরআন তিলাওয়াত শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। আছে গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম। ফলে ভবনটি স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি শিক্ষা ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে।

মালাগার এই মসজিদের বিশেষত্ব তার বয়সে নয়; বরং অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষমতায়। কর্ডোবার খিলান, আন্দালুসি অলংকরণ, স্পেনের মার্বেল, পানি ও কাঠের স্থাপত্য- সব মিলিয়ে এটি মধ্যযুগীয় আন্দালুসের স্মৃতিকে আধুনিক মালাগায় ফিরিয়ে এনেছে। তাই মসজিদটি শুধু একটি ইবাদতগাহ নয়; এটি ইতিহাস, স্থাপত্য ও সমকালীন মুসলিম সংস্কৃতির এক মিলনস্থল।

সূচীপত্র

তাওহীদ ও সুন্নাহ'র অনুসরণই মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের মূলভিত্তি

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন- ২০২৬

সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ নানা সংকট, বিভ্রান্তি ও বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ সময়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিশুদ্ধ দাওয়াহ্, নির্ভরযোগ্য ইসলামী জ্ঞানচর্চা এবং উম্মাহর মধ্যে সচেতনতা ও ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস আগামী **৫ ও ৬ নভেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাভারের বাইপাইলে জমঈয়ত ক্যাম্পাসে** আয়োজন করতে যাচ্ছে দুই দিনব্যাপী-

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০২৬

এই মহাসম্মেলনে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান আলেম-উলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য, দাওয়াহ্, শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকনির্দেশনা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করবেন ইনশা-আল্লাহ।

তাওহীদ ও সুন্নাহপ্রেমিক ভাইয়েরা, আপনারা জানেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অতীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস, পবিত্র কা'বার ইমাম শাইখ আব্দুল্লাহ আস-সুবাইল (রহ.), মসজিদে নববীর ইমাম আলী বিন আব্দুর রহমান আল হুযাইফী এবং শাইখ আব্দুল মুহসিন মুহাম্মদ আল কাসিম, সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহর সাবেক উপদেষ্টা ও রাবেতা আলম আল ইসলামির সাবেক মহাসচিব ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কীসহ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, পাকিস্তান, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, কাতার, বাহরাইন, ভারত) শীর্ষ সালাফী উলামায়ে কিরাম মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এবারও ইনশা-আল্লাহ আরও বেশি সংখ্যক দেশের ইসলামী স্কলারগণ অংশগ্রহণ করবেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা, আমরা মনে করি, এটি কেবল একটি সম্মেলন নয়; বরং এটি ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াহ্, ইলমের প্রসার, উম্মাহর জাগরণ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি নির্মাণের মহতী প্রয়াস। আর এ ধরনের আন্তর্জাতিক আয়োজন বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই আমরা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী সর্বস্তরের মুসলিমদের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানাই- আসুন, এই মহতী উদ্যোগে আর্থিক অনুদান, পৃষ্ঠপোষকতা, দু'আসহ **সর্বাত্মক সহযোগিতার** মাধ্যমে শরীক হই। কারণ মহান আল্লাহ বলেন: **তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো।"** (সূরা আল মায়িদাহ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বলেছেন: **"যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণের পথ দেখায়, সে সেই কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।"** (সহীহ মুসলিম)

আমরা বিশ্বাস করি, আপনার আন্তরিক অনুদানের ফলে লাখো মানুষ বিশুদ্ধ ইসলামের মর্মবাণী শুনবে। আপনার আমলনামায় অবিরাম যুক্ত হবে সাদাকায়ে জারিয়ার সওয়াব। আপনার দান ইলম, দা'ওয়াহ, হিদায়াহ্ এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এক স্থায়ী বিনিয়োগে পরিণত হবে- ইন শা-আল্লাহ।

আসুন! আমরা সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই মহতী দ্বীনি উদ্যোগে অংশগ্রহণ করি। আপনার সামান্য সহযোগিতা, আপনার পরিবারের দান, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা- সবই হতে পারে ইসলামের খেদমতে অনেক মূল্যবান অবদান। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন এবং দীনী কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করতে

বাংলা QR কোড
যেকোনো মোবাইল অ্যাপ দিয়ে
সহজেই স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট :
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
সঞ্চয়ী হিসাব নং
20501180200**2856**00
ইসলামী ব্যাংক
নবাবপুর রোড শাখা।

বিকাশ, নগদ, রকেট (পার্সোনাল)
01933 355905

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
+8802224458551
+8801933 355 901
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd

অনুরোধে

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর পক্ষে

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
আহ্বায়ক
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন কো-অর্ডিনেশন কমিটি

প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
শাইখ ড. মুহাম্মদ হারুন হুসাইন
যুগ্ম-আহ্বায়ক
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন কো-অর্ডিনেশন কমিটি

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন
সদস্য সচিব ও যুগ্ম সদস্য সচিব
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন কো-অর্ডিনেশন কমিটি

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

তাওহীদ ও সুন্নাহ'র অনুসরণই
মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের মূলভিত্তি

আন্তর্জাতিক ইসলামী
মহাসম্মেলন
২০২৬

৫-৬
নভেম্বর, ২০২৬
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস
বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বক্তব্য প্রদান করবেন

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোয় আলোকিত জীবন গড়তে **মহাসম্মেলনে** যোগ দিন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত